৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭ .

যুগ পরিবর্তন



ডায়ানার মৃত্যু কি নিছক দুর্ঘটনা ?

- কেউ কিছু দেখেনি
- পূজোয় প্যাকেজ ট্যুর


দেবজ্যোতি
ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন



পুজো মানে ছুটি
পুজো মানে শরৎমেঘে
রোদের লুটোপুটি

পুজো মানে বাধা বাঁধন ছেঁড়া
পুজো মানে ঘরের টানে
দেশের বাড়ী ফেরা

পুজো মানে আড্ডা
পুজো মানে দুষ্টুমি আর
ছোট বৌদির গাট্টা

পুজো মানে ঠাকুর দেখতে যাওয়া
পুজো মানে গলির মোড়ে
দেদার ফুচকা খাওয়া

পুজো মানে প্রথম শাড়ী পরা
পুজো মানে প্রথম দেখা
প্রথম প্রেমে পড়া

পুজো মানে গড়িয়াহাটার মোড়
পুজো মানে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে
রাত্রি থেকে ভোর

পুজো মানেই ঠাকুর আসবে কতক্ষণ
পুজো মানেই ঠাকুর যাবে বিসর্জন

শালিমার
নারকোল তেল



আনন্দে উৎসবে বাংলার ঘরে ঘরে

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-২৭.

যুগ পরিবর্তন



প্রচ্ছদ কাহিনী

ডায়ানার মৃত্যু দুর্ঘটনা না অন্যকিছু? এই মৃত্যুর পেছনে কোন চক্রান্ত রয়েছে বলে অনুমান করা কি খুব ভুল হবে?

ভারত পথিক অ্যালেনা



স্লোভাকিয়া থেকে এক ভারত পথিক ভারত সন্ধানে এসেছেন। রুশ, স্লাভাক ও ভারতীয়দের সহযোগিতায় তৈরি করেছেন রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তিন পর্বের একটি ভি, ডি, ও, ফিল্ম। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রী অ্যালেনার ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ওপর তৈরি সাক্ষাৎকারমূলক প্রতিবেদন।

তৃণমূলে মমতা



প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপর্যস্ত। হাইকমান্ডও বিব্রত। তবে লাভের মধ্যে বামফ্রন্ট একটু স্বস্তিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের কিন্তু মুল লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি, পি, এমকে উৎখাত করা।

সম্পাদক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়
নির্বাহী সম্পাদক—ক্রিস্টোফার ঘোষ
সহকারী সম্পাদক—প্রবীর চক্রবর্তী
শিল্প নির্দেশক—প্রবীর দাস
আলোক চিত্রী—গৌতম রায়
প্রতিবেদক—হীরক কর ও প্রসেনজিৎ সিংহ
সম্পাদকীয় ● বিজ্ঞাপন ● সার্কুলেশন
২৮বি, শেকস্‌পিয়ার সরণি, (নাইনথ্ ফ্লোর) কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন ঃ ২৪০-২১৭৩
মুম্বাই অফিস ঃ
ফ্ল্যাট নং ৪ গ্রাউন্ড ফ্লোর
কিশোর কুমার গাঙ্গুলি মার্গ, জুহুতারা রোড, মুম্বাই ৪০০০৪৯
দাম ঃ ৫ টাকা
নিউজ এক্স-এর পক্ষে ক্রিস্টোফার ঘোষ কর্তৃক লালচাঁদ রায় অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ৭, গ্র্যান্টলেন, কলিকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অক্ষর বিন্যাস ঃ কল্পতরু অ্যাসোসিয়েটস্, বিমান মাসুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ঃ ২৫ পয়সা

পাঠক মন

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চমৎকৃত হলাম যুগ পরিবর্তন বেরুচ্ছে।

আবার 'পরিবর্তন' এই কি সেই 'পরিবর্তন'? ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে শুরু হয়েছে এই গুঞ্জন। তাহলে বোধহয়, বাংলার সংস্কৃতি সম্পন্ন পাঠক আবার একটা ভালো পারিবারিক পত্রিকা হাতে পাবে। আবার, আগের মত প্রতি বুধবারে করতে হবে অপেক্ষা। কখন পাবো সেই সেরা পত্রিকাটি। মনের দশ দিগন্ত খুলে সেরা-সেরা লেখার ডালি নিয়ে আবার কখন আসবে আমার হাতে। যেন এক ঢোকে পড়ে ফেলবো সমগ্র পত্রিকাটি। তবে অনুরোধ একটাই, গ্রাম-বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, খেলাধুলা, রাজনীতি, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে শহর ও শহরতলীর মানুষের জীবন পাঁচালি স্থান পায়। আর একটা কথা, লেখকের নামে নয়, লেখার উৎকর্ষতাই যেন হয় পরিবর্তনের মাপকাঠি।

চিত্রা হালদার (শিক্ষিকা) জয়নগর মজিলপুর, দঃ ২৪ পরগণা

৩ সেপ্টেম্বর 'যুগ পরিবর্তনের' শুভ জন্মলগ্নে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি। অনুরোধ, চিঠি-চাপাটি বিভাগটিতে যেন বিতর্ক চালু হওয়ার জন্য জায়গা একটু বেশি থাকে।

আশা করছি গ্রাম বাংলার চালচিত্র অবশ্যই প্রাধান্য পাবে এই পত্রিকায়। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের আলোচনারও প্রাধান্য প্রয়োজন। আর একটা কথা, 'ভ্রমণ' বিষয়টি সাধারণ মধ্য বিত্তের কথা ভেবেই যেন উপস্থাপিত হয়। কেননা কুঁজোরও চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছে জাগে। আর হিসেব করলে, বাঙালি, পর্যটক বলতে মধ্যবিত্তরাই বেশি। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে শুধু পাতা না ভরিয়ে, প্রাধান্য দেওয়া হোক একেবারে লেটেস্ট ইনফরমেশনগুলোর প্রতি। পাঠক এতেই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি যাতে করে, ভ্রমণ মনস্ক পাঠকের কছে পত্রিকাটি অপরিহার্য হয়ে ওঠে এই বহু আশার যুগ-পরিবর্তন। ভ্রমণের জন্য বরাদ্দ চারটি পৃষ্ঠাই যথেষ্ট আর মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ হোক যুগপরিবর্তনে। পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কালিতলা, রিষড়া, হুগলী।

তোমার আবির্ভবে আসুক
'যুগের পরিবর্তন
জন্মদিনে তাইতো জানাই
উষ্ণ অভিনন্দন।

নামেই তোমার চমক আছে,
তাই, প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা আছে।
গ্রাম, গঞ্জ, নগর শহরবাসীর জিজ্ঞাসা;
'যুগ-পরিবর্তন' এসে
মেটাবে মনের আশা।

অনির্বান, অভিযান
টালিগঞ্জ, কলি-৩৩

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর। এই শুভলগ্নে 'যুগ-পরিবর্তনের' আবির্ভাব। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তন মানুষ এখন মনে-প্রাণে চাইছে। তাই এই মুহূর্তে মুখোশের আড়ালে মুখ না ঢেকে, সমাজের পরিবর্তনের প্রয়োজনে, প্রয়োজন ভাল পত্রিকা। আরও পাঁচটা সস্তা পত্রিকার মত যেন পণ্যের বাজারে হারিয়ে না যায়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে ভাল ম্যাগাজিনের খুবই অভাব। বিষয়-বৈচিত্রের পূর্ণ ম্যাগাজিনের প্রকাশ বাঙালি পাঠকসমাজে বিজ্ঞাপনেই সাড়া ফেলে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

অনুরোধ, রাজ্যের প্রতিটি জেলাকে নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত কর্মকান্ড প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করা হোক। এতে প্রতিটি জেলাবাসী অন্ততঃ তাঁদের জেলার স্বাধীনতার পটভূমিকায় অবদানের কথা জানতে পারবেন। এছাড়াও জেলা ভিত্তিক রাস্তা ঘাট, প্রত্নতত্ত্ব, যানবাহন, কৃষি, সেচ, স্বাস্থ্য, ও শিক্ষা সমস্যা নিয়ে এক একটি সংখ্যায় প্রকাশ পাক। সম্পাদক মহাশয়, একান্ত অনুরোধ বাংলার আশি শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে গঞ্জে। বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির অন্যতম ধারক হল গ্রাম। এই গ্রাম যেন উপেক্ষার কোপে না পড়ে।

চিত্তরঞ্জন মান্না, বসন্তকুঞ্জ, নিউদিল্লি।

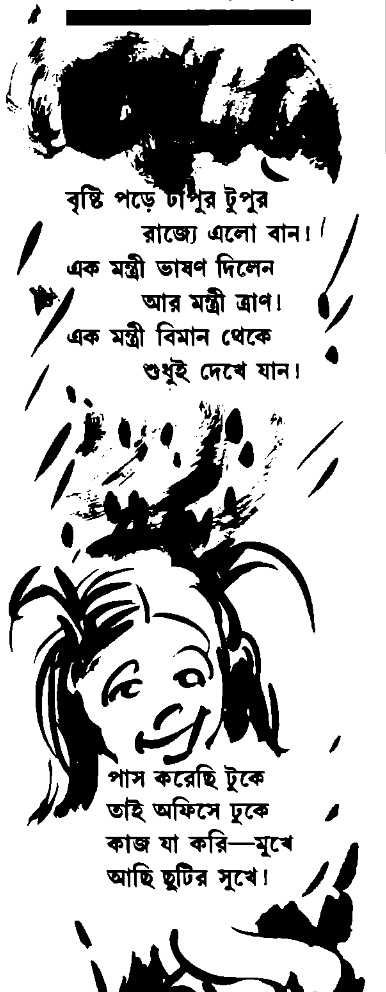
> **মননশীল চিঠি পাঠান। ছোট্ট কিন্তু সাহিত্যরস সম্পৃক্ত। দেশের কথা, সমাজ সমস্যা সব কিছু নিয়ে লিখুন। কিন্তু লজ্জা পাবেন না নিজের কথা লিখতে।**
>
> **সম্পাদক**

রাজনীতির কচকচানি আর ভাল লাগে না। চর্বিত চর্বন ছাড়া আরও কিছুই দিতে পারছে না পত্রিকাগুলো। বড্ড একঘেয়ে জীবনযাত্রা। তাই প্রয়োজন পরিবর্তনের। যুগ-পরিবর্তন এই আশা মেটাবে বলে আশাবাদী।

মানুষ চাইছে নতুন কিছু পেতে। তাই পত্রিকাকে হতে হবে পরিবারের অভিভাবক। পত্রিকাই পরিচালনা করবে পরিবারকে। সংসারের যে মানুষটি যা যা ভালবাসে, একটা পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা যেন তেমনটি পরিবেশন করে। আর পড়ার টেবিলে, তাকে যেন রাখা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে সাড়া ফেলুক 'যুগ-পরিবর্তন'। চাহিদা পাঠকের অনেক। আস্তে আস্তে পূর্ণ হলেই হবে। গ্রাম বাংলার অবস্থা প্রতিটি প্রবাসী বাঙালি জানতে চায়, পড়তে চায়। তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর লেখা মানুষ চাইছে বেশি। বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশে বাঙালির অবস্থা, বাঙালি পাঠকই পড়তে চায় বেশি। যেহেতু বাংলা ম্যাগাজিন তাই বাঙালি পাঠকদের এখানে প্রাধান্য রয়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের দুরবস্থার কথা লেখা হোক যুগ পরিবর্তনে। কবিতায় ভেসে লাভ নেই। ক্ষুধার রাজ্যে যেখানে পৃথিবী গদ্যময়, সেখানে বাস্তবের প্রতিটি ঘটনা, তদন্ত মূলক কাহিনী, সরকারের কড়া সমালোচনা, নেতাদের আসল চরিত্র সবই উম্মোচিত হোক যুগ-পরিবর্তনে। এই পত্রিকা মানে বাংলার পত্রিকা, বাঙালির পত্রিকা। পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই কামনা করি।

বিনীত
দেবশ্রী চক্রবর্তী
মানসসরোবর ঘাট, বেনারস, উত্তর প্রদেশ

গাঁ • ট • ছ • ড়া



ছড়া : উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
অঙ্কন : প্রবীর দাস

কি বিচিত্র এই দ্যাশ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই ব্যবস্থার ওপরেই নানা ধরণের জোড়াতালি লাগানো চলছে। তার ফলে ভারতের অবস্থা এখন মেরা জুতা হ্যায় জাপানি পাৎলুন হিন্দুস্থানির মত। নেই নেই করেও গত ৫০ বছরে ভারতের বৈষয়িক উন্নতি ঈর্ষা করার যোগ্য। ইউরোপে আরবদের পরেই বড় লোক বলে ভারতীয়দের নাম। ভারতীয় নব্য ধনীরা এখন সিঙ্গাপুর হংকং বাজার করতে যান। ব্যাঙ্ককে যান সেক্স ট্যুর করার জন্য। জেট সেট ভারতীয় এগজিকিউটিভরা প্রতিদিনই দিল্লী-মুম্বাই থেকে লন্ডন, প্যারিস ফ্রাঙ্ক ফুটে ছুটছেন অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে। ভারতের বাজারে ৫০ হাজার কোটি কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে আর সেই কালো-টাকার ভাগ শুধু ব্যবসদার ঠিকাদার, মাফিয়া, পলিটিসিয়ানরাই পাচ্ছেন না, হেড অফিসের যে বড় বাবু বিল পাশ করেন, তিনিও তার ভাগ পেয়ে থাকেন। আয়করকে ফাঁকি দিয়ে অথবা ঘুষ খাইয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, লেখক, ইঞ্জিনিয়ারাও ফুলে ফেঁপে উঠছেন কালো টাকায়। আমাদের দেখে আয়করের এমনই কাঠামো যে ন্যায্য আয়কর দিলে কারও পক্ষে ধনী হওয়া সম্ভব নয়, অথচ দেশে হাজার হাজার ধনী ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করেছেন, একের পর এক মারুতি জেন থেকে মার্সিডিজবেঞ্জের মালিক হচ্ছেন। এমনকি ভারতে ১০ কোটির মত মধ্যবিত্ত শ্রেনী তৈরি হয়েছে যাদের ক্রয় ক্ষমতা গড় আমেরিকানদের মতই।

অন্যদিকে ভারতে ৩০ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। গরিবের রোজগার এতই কময়ে ধনীদের আয় যোগ করেও গড় ভারতীয়দের মাথা পিছু আয় ১৯৭৯-৮০ সালের মূল্য মান অনুসারে বছরে ১৪৮৫ টাকা। সে জায়গায় আমেরিকার মানুষের মাথা পিছু আয় ২৩২৬৯ টাকা, ব্রিটেনের ১৮,১২৩ টাকা। ভারতের এক লক্ষ গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ গিয়ে পৌছয়নি। পানীয় জল নেই কয়েক হাজার গ্রামে। দু ধরণের ভারত তৈরি হয়েছে, একদলে আছে সংগঠিত কর্মচারীরা। যেমন বড় কার্পোরেট সেক্টারের কর্মী, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও খোদ সরকারি কর্মচারীরা। শিক্ষক, অধ্যাপক, বড় কাগজের সাংবাদিক। ম্যানেজমেন্ট পাশ করা একটি ছেলে পাশ করার আগেই মাসে ত্রিশ চল্লিশ এমনকি সত্তর হাজার টাকা মাইনের চাকরি পায়। সরকারি কর্মীদের বেতন বার বার বাড়ে এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পাঁচহাজার টানা বেতন পেয়েও সন্তুষ্ট হয় না। অন্যদিকে অসংগঠিত শিল্পে, ছোট প্রতিষ্ঠানে, স্বনিয়োজিত বহু ধরণের কাজে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক দেড় হাজার টাকা বেতনে দশ বারো ঘন্টা পরিশ্রম করে। তার চাকরির স্থায়িত্ব নেই, তার পি, এফ, গ্রাচুরিটি নেই। এছাড়া আছে পনের কোটির ওপর বেকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় সঙ্কোচের নাম করে কয়েক লক্ষ পদে আর লোক নিয়োগ করছেনা। সুতরাং বেকার সমস্যা কমার আশু আশা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আর খালি পদে লোক নিয়োগ করছেন না। শত শত শিক্ষক অধ্যাপক আর করণিদের পদ খালি রেখে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবেতনে কর্মরত ব্যক্তিরা যখন টি ভি, ফ্রিজ, ওয়াশিংমেশিন, মোটরগাড়ি ও গহনার দোকানের ভিড় করছেন অসংগঠিত সেক্টারের গরিব কর্মী ও বেকার মানুষেরা তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। ভোগবাদ ও আরামপ্রিয়তা মানুষের কাছে নেশারমত হয়ে গিয়েছে। তারা আরও ভোগ্য পণ্য কেনার জন্য ঘুষ নিতে শুরু করেছেন। গরিবদের মধ্যে জাগছে লোভের আগুন। তারা হয়ে উঠছে সমাজবিরোধী, যোগ দিচ্ছে মাফিয়া গোষ্ঠীতে। রাজনীতির লোকেরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে, মদত দিচ্ছে। অস্ত্র চালানকারী ও ড্রাগচক্র, বিদেশী মিশনারি ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে সন্ত্রাসবাদী গড়ে তুলছে। ভারতকে নৈতিক অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে রাজনীতিবিদ ও টেলিভিশন কম্পানি গুলি।

রাজনীতিবিদরা এখন নিজেরা এক একটি স্ক্যামে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তারা তার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। বরং গরিব জনগণের ৯৫০ কোটি টাকা গায়েব করে দিল যে লোকটি তাকে মদত দেওয়া জন্য এগিয়ে এল কংগ্রেস যারা এখন দুর্নীতির আর দুনম্বরির পাঁকে ডুবে আছে। যাদের নেতাদের নামে একের পর এক স্ক্যামের মামলা। কেন্দ্রের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে কাশ্মীরে, উত্তর পূর্ব সীমান্তে, বিহারে, অন্ধ্রে উগ্রপন্থীরা মগের মুলুক তৈরি করেছে। এতদিন কংগ্রেস বিরোধীরা এর জন্য দায়ী করত কংগ্রেসকে, আর ত্রিপুরার বাম সরকার উগ্রপন্থীদের তোষণ করে আসা সত্ত্বেও সেখানকার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত করে ছেড়েছে উগ্রপন্থীরা। অসমে আলফা ও বোরো উগ্রপন্থীরা কিলিং ফিল্ড তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মোহান্তও উগ্রপন্থীদের খতম তালিকায়। কাশ্মীরে শেখ আবদাল্লা বৈরী সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ। নির্বাসিত কাশ্মীরী পন্ডিতরা সাত বছর পরেও দেশে ফিরতে পারছেনা। মণিপুরে চলেছে যুদ্ধকালীন অবস্থা। সেখানে বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করছে। নাগাল্যান্ডের বৈরীদের সংগঠনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা বসবে জেনেভাতে। এত শক্তিশালী তারা।

ভারতে জাতপাতের রাজনীতির বাক্স খুলে দিয়েছিলেন ভিপি সিংহ। সেই বিষে ভারত এখন জর্জরিত। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে জাতপাতই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তির উৎস। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও চলছে জোড়াতালি। তালি মারতে হচ্ছে ভেতরের ভন্ডামি চাপা দেবার জন্য। মনমোহনি মুক্ত অর্থনীতি মেনে নিয়েও বাম নেতা জ্যোতি বসু বিদেশীদের কাছে যুক্ত করে মূলধন ভিক্ষা করছেন আবার অন্যদিকে তারই সংগঠন সিটু ও সহযাত্রী কংগ্রেসীরা মিলে ইস্কোর ও গ্রেটইস্টার্ণ হোটেলের বেসকারিকরণের বিরোধিতা করছে। স্বাধীনতা দিবসে তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সমাজতন্ত্রকেই মুক্তির পথ বলে রায় দিয়েছেন। অথচ জ্যোতি বসু চান মুক্ত অর্থনীতি সত্যি 'সেলুকাশ কি বিচিত্র-এই দ্যাশ'।

কাঠমাণ্ডুতে আটদিন



ছবি: লেখিকা

কাঠমাণ্ডু থেকে পোখরা হয়ে নগরকোট হয়ে গাইদা ওয়াইল্ড লাইফ পর্যন্ত আটদিনে ঘোরা। প্লেন ভাড়া নিয়ে মাত্র ৮ হাজার টাকায়। প্লেন ভাড়া বাদ দিলে, মাত্র চার হাজার টাকায়। অথচ গাইদায় এক রাত্তির কাটাতেই যে লাগবে ৫ হাজার টাকা! এই অনবদ্য অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন চিত্র সাংবাদিক পূরবী দাশগুপ্ত।

প্রথম দিন : সকাল ৯-১৫তে দমদমের ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট থেকে ছাড়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর (এয়ার ইন্ডিয়ার নয়) কাঠমাণ্ডু ফ্লাইট। আমাকে বলা হয়েছিল, "আপনি লাগেজ আর ক্যামেরা এবং তস্য সরঞ্জাম নিয়ে এয়ারপোর্টে সকাল ৮টার মধ্যে রিপোর্ট করবেন। আলাদাভাবে সঙ্গে রাখবেন এয়ারট্যাক্স দেওয়ার জন্য ১৫০ টাকা। ওই টাকাটা প্যাকেজে ধরা নেই। যেমন ধরা নেই কাঠমাণ্ডু থেকে আসার সময় মাথাপিছু ৩৭৫ টাকা এয়ারট্যাক্স। কাঠমাণ্ডুর এয়ারট্যাক্স আমাদের তুলনায় বেশি"।

যেমন বলা তেমন কাজ। ঠিক আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি কলকাতার 'এক্সটিক ডেস্টিনেশন-এর লোকজন এয়ারপোর্টে আমাকে নির্বিঘ্নে রওনা করে দেওয়ার জন্যে উপস্থিত।

আমাকে কোনওরকম ঝক্কি পোয়াতে হল না। 'চেকইন ব্যাগেজ' চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নেওয়ার আগে আমার কাছ থেকে ১৫০ টাকা নিয়ে এক্সটিক ডেসটিনেশন-এর তৎপর কর্মীরাই আমার এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দিয়ে টিকিটে লাগাবার জন্য ট্যাগ নিয়ে এলেন। তারপর ব্যাগেজ চেক ইন হয়ে গেল। হ্যান্ডব্যাগে ট্যাগ লাগিয়ে নিলাম।

ইন্টারন্যাশানাল ফ্লাইট সুতরাং ফর্ম ভর্তি করার একটা ব্যাপার আছে। নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা, জন্ম তারিখ এবং সাল, চাকরি, কী জন্যে যাচ্ছি, কতদিন থাকব, একা যাচ্ছি না গ্রুপে, এর আগে নেপাল গেছি কি না, এইসব জানাতে হয়। ভারতীয়দের নেপাল যেতে পাসপোর্ট লাগে না। তবে পরিচয়পত্র অবশ্যই লাগে



ছবি ঃ লেখিকা

তেইশের পাতার শেষাংশ

আপনি যে ভারতীয়, তা প্রমাণ করতে। এই পরিচয়পত্র দাখিল করতে হয় যাতায়াত নিয়ে চারবার। দু-বার কলকাতায়। দু-বার কাঠমাণ্ডুতে। ন্যূনতম নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্র র‍্যাশন কার্ড। তবে পাসপোর্ট থাকলে সঙ্গে নেবেন।

সিকিউরিটি চেক-এ ঢুকে যাওয়ার পর আমি একা। তবে ব্যাপারটা সড়গড় হয়ে গেছে। প্রথমেই বোর্ডিং পাস, ভর্তি করা ফর্ম এবং পাসপোর্ট দাখিল করলাম। ওঁরা সবকিছু কম্পিউটারে তুলে নিয়ে আবার বোর্ডিং পাসে ছাপ মারলেন। এরপর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া টিকিট ব্যাগে রেখে শুধুমাত্র বোর্ডিং পাস নিয়েই বাকি কাজ সারা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সিকিউরিটি চেক-এ বোর্ডিং পাস দাখিল করলে সেটা ওঁরা প্যাসেঞ্জার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে আমার নামের পাশে টিক দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে কোনও দামি বিদেশি জিনিস থাকলে তা আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে। দামি বিদেশি জিনিস বলতে চিত্রসাংবাদিক হিসেবে আমার একাধিক ক্যামেরা এবং রকমারি লেন্স। সব আমার পাসপোর্ট-এ 'এনট্রি' করা আছে। সুতরাং ওঁদের চেক করতে দু-মিনিট লাগল। এবার যেতে হবে সিকিউরিটি চেকের তৃতীয় পর্যায়ে। কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট অথচ জরুরি কাজ হল বাইরে লাগেজ-লাউঞ্জে গিয়ে নিজের চেকড-ইন লাগেজ আইডেনটিফাই করা। নিজের সুটকেসটি খুঁজে পেতে সামান্য সময় লাগল। ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বললাম, "এইটে আমার সুটকেস"। উনি আমার লাগেজ-ট্যাগের নম্বরের সঙ্গে সুটকেসের গায়ে লাগানো নম্বর মিলিয়ে সুটকেসের গয়ে খড়ির দাগ দিলেন। ইতিমধ্যেই অবশ্য ফিল্ম সেক এক্সরের মধ্যে সুটকেসের ভেতরে কী আছে, তা চেকড হয়ে 'ও-কে' পেয়ে গেছি।

এবার সিকিউরিটি চেক-এর তৃতীয় পর্যায় ঃ অ্যাসকেলেটর-এ উপরে উঠলাম। মেটাল ডিটেকটর দিয়ে বডি চেক করা হল। তার আগে হ্যান্ডব্যাগ, ক্যামেরাব্যাগ সব গেল এক্সরের মধ্যে দিয়ে। এখানে বোর্ডিংপাসে আবার ছাপ পড়ল 'ও-কে' বলে। একটা কথা, ক্যামেরায় যদি ব্যাটারি লাগানো থাকে তা ধরা পড়ে এক্সরে এবং মেটাল চেকিং-এ। এবং তখন ক্যামেরা বার করে চেক করা হয়। সিল্ড ক্যান বা ব্যাটারি ভর্তি ক্যামেরা তাই না নিয়ে যাওয়াই ভাল।

কী ভাগ্যি প্লেন উড়ল সকাল ৯-৩০-এ। অর্থাৎ মোটামুটি ঠিক সময়ে। এক ঘন্টার ফ্লাইট। সুতরাং উড়তে উড়তেই নামার সময় হয়ে যায়। তার মধ্যে দুটি কাজ। এক, নিরামিষ বা আমিষ লাঞ্চ সেরে নেওয়া। সঙ্গে কফি বা চা। আর কাঠমাণ্ডুতে ঢোকার জন্য আবার একটি ফর্ম ভর্তি করা। অনেক সময় এই ফর্ম প্লেনেই দেওয়া হয়। অনেক সময় হয় না। যদি ফর্ম প্লেনে না পান তাহলে ত্রিভুবন এয়ারাপোর্টে ঢুকেই দেখবেন টেবিল ভর্তি ফর্ম। তাড়াতাড়ি ফিল-আপ করে নেবেন।

পৌনে এগারটার সময় কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছুন গেল। প্রবেশপত্র, পাসপোর্ট (বিকল্প পরিচিতিপত্র) দেখিয়ে ঢুকলাম ভিন দেশে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরবার আগে আবার একটি ছোট্ট কাজ। দরজার ধারেই দুটি মেয়ে বিনি পয়সায় বিলি করে নেপাল ট্র্যাভেলস পত্রিকার সদ্য-প্রকাশিত সংখ্যা। ওটি নিয়ে নেওয়া।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই দেখি, সামনেই জাপানি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক্সটিক ডেসটিনেশনস-এর মালিক দাশগুপ্তদা। ৩০ বছর ধরে চালাচ্ছেন ভ্রমণ-বাণিজ্য। এক ডাকে সবাই চেনে। নির্ভরযোগ্য, সৎ ভ্রমণবন্ধু হিসেবে।

উনিই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন 'রা-রা' হোটেলে। ভারি আরামের থ্রি-স্টার হোটেল। কাঠমাণ্ডুর একেবারে মধ্যিখানে প্রতি ঘরে কার্পেট। স্টার টিভি। চমৎকার বাথরুম, আসবাব। বিছানার পাশে টেলিফোন।

হোটেলে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গেই লাঞ্চ। এই হল কাঠমাণ্ডুর গুণ। ঘন ঘন খিদে পায়। আর কাঠমাণ্ডুতে ক্লান্ত লাগে না কখনও। সেটাই এখানকার ম্যাজিক।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেল তিনটের স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আলোয় যাত্রা করলাম ৬৫০০ ফুট ওপরে দক্ষিণী কালীর মন্দির দেখতে। দুই নদীর সঙ্গমে এই মন্দির। হিন্দুদের তীর্থস্থান। তাই তীর্থযাত্রীদের ভিড় সব সময়েই থাকে। মন্দিরের চার পাশে জঙ্গল ঘেরা খাদ। তাই ভিড় সত্ত্বেও নির্জন মনে হয়। বিকেলের আলো পড়ে যাওয়ার আগেই অবশ্য মন্দির প্রাঙ্গণ ছাড়লাম। তার কারণ একটাই—রাতের অন্ধকারে পাহাড়, খাদ, জঙ্গল আর সরু পাহাড়ি পথ খুব নিরাপদ নয়। কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণে বলেই এই কালীর নাম দক্ষিণী কালী।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে বেশ সন্ধে হয়ে গেল। ফিরেই এক কাপ কফি। তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়াই ভাল মনে করলাম। কারণ কাল সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

দ্বিতীয় দিন : সকাল ৯টা। রা-রা-তেই ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি। দাশগুপ্তদা আজকে এক্সটিক নেপাল ট্যুয়র্স-এর তরফ থেকে কাঠমাণ্ডুর চারটি দর্শনীয় জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবেন। সকালে পশুপতিনাথ, এবং বৌদ্ধনাথ স্তুপ। বিকেলবেলা, বুদ্ধনীলকণ্ঠ এবং পাহাড় চূড়ায় স্বয়ম্ভুনাথ। কাঠমাণ্ডু এসে এই চারটি দর্শনীয় দেবস্থানে না গেলে এখানে আসাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পশুপতিনাথ সেই পুণ্যতীর্থ যেখানে যাননি এমন হিন্দু কাঠমাণ্ডুতে আসেননি। কাঠমাণ্ডুর পুবদিকে। একবার অন্তত সেখানে পুজো দিতে যেতেই হয়। বাগমতী নদীর ধারে এই মন্দির। এই নদীর ধারে, মন্দিরের পাশে স্বামীর মৃত্যুর পর একদা কত নারী সতী হয়েছেন। এখনও মন্দিরের ধারে বাগমতীতে বহু স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে স্নান করেন এই আশায় যে তাঁরা পরের জন্মেও স্বামী-স্ত্রী হতে পারবেন। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের চারখাঁজ শিবের চার মুখ। বৌদ্ধরা আবার মনে করেন একটি মুখ বুদ্ধের। প্লেন থেকে এই মন্দির দেখা যায়। পশুপতিনাথের মন্দির ভারি সুন্দর। যেন সোনার প্যাগোডা। তৈরি হয়েছিল সতের শতকে। তবে ঠিক এই জায়গাতেই দু-হাজার বছর আগেও মন্দির ছিল।

পশুপতিনাথের মন্দির থেকে আর একটু পুবদিকে গেলেই পৌঁছানো যায় বৌদ্ধনাথ স্তুপে। এই স্তুপ পৃথিবীর বৃহত্তম স্তুপগুলির একটি। নেপালের তিব্বতিদের মহাতীর্থ। এই স্তুপ তৈরির পিছনে একটা গল্প আছে। নেপালে একবার প্রচণ্ড খরা হয়। লিচ্ছবি রাজ বিক্রমজিৎ তখন পুত্র মনদেবকে ডেকে বলেন, এই খরার অবসান হতে পারে দেবতার কাছে বলিদান দিলে। এবং আদেশ করেন রাতের অন্ধকারে রাজ জলাশয়ের পাশে যে মানুষটকে ছায়ার মতো দেখা যাবে, মনদেব যেন তাঁকেই দেবতার উদ্দেশে হত্যা করেন। মনদেব তাই করলেন। এবং ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেল তিনি তাঁর বাবাকে হত্যা করেছেন। পাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনদেব তৈরি করেন এই স্তুপ। স্তুপটি সত্যিই এত উঁচু যে অবাক হয়ে দেখার মতো। চূড়ার চারপাশে বুদ্ধের সন্ধানী নীল চোখ। চার চোখের ওপরে চূড়ার ওপর তেরটি চক্রের সোপান—নির্বাণের ক্রমিক প্রতীক। সব মিলিয়ে এমন এক সৌন্দর্য যা মুগ্ধ করে।

হোটেলে ফিরে সামান্য বিশ্রাম। তারপর সাড়ে চারটেতে বেরলাম বুদ্ধনীলকণ্ঠ দেখতে। বুদ্ধনীলকণ্ঠ ভারি মজার ব্যাপার। কাঠমাণ্ডুর উত্তরে গিয়ে বুদ্ধনীলকণ্ঠ নামের যে দেবতার সামনে হাজির হলাম, তিনি জলশয্যায় ঘুমিয়ে রয়েছেন। এই দেবতার সঙ্গে বুদ্ধের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে বুদ্ধ মানে বুড়ো। অর্থাৎ বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ তো শিবের নাম। তিনি জলে শুয়ে থাকবেন কেন? আসলে, বুদ্ধ নীলকণ্ঠ হলেন জলশয্যায় শায়িত নারায়ণ। মূর্তিটি যে সুপ্ত নারায়ণের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁকে কেন নীলকণ্ঠ বলা হবে, এ-প্রশ্নের কোনও সঠিক উত্তর পাওয়া শক্ত। যাই হোক, নেপালের রাজা কখনও জলশয্যায় নারায়ণকে দেখতে আসেন না। নেপালের ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজা নিজেই নারায়ণের অংশ। তাই নেপালের রাজারা কখনই নিজের মূর্তি জলশয্যায় দেখতে আসেন না। এলে বংশের সর্বনাশ হবে।



ছবি ঃ লেখিকা

কাঠমাণ্ডুতে আর কিছু দেখুন না দেখুন, স্বয়ম্ভুনাথে যাবেনই যাবেন। বেশ খানিকটা দূরে এই স্বয়ম্ভুনাথের পাহাড়-চূড়া মন্দির। গাড়ি এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। বাকি পথটুকু উঠতে হল পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে। সিঁড়ি ভর্তি বাঁদর আর তীর্থযাত্রী। সে এক মজার দৃশ্য।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির দু-হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপ। কাঠমাণ্ডুর ওপর এই স্তূপের প্রভাব অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা মনে করেন স্বয়ম্ভুনাথই কাঠমাণ্ডুর শক্তির কেন্দ্র। স্তূপের শেষ সিঁড়ি পেরিয়ে যখন সামনে দাঁড়ালাম, নিজেকে বড় ছোট, সামান্য মনে হল। অনেক নীচে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা তখন সূর্যাস্তের রঙে রাঙা।

তৃতীয় দিন ঃ এক্সটিক ট্যুরর্স আমার মনের কথা বুঝে আজ সকালটা আমাদের নিজেদের ইচ্ছে মতো কাটাবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। অন্যেরা কী করবেন জানি না। আমি আজ সকালে একটু কেনাকাটা করতে প্রথমেই গেলাম থামেলে। থামেলের মধ্যে দিয়েই স্বয়ম্ভুনাথের পথ। থামেল হল সস্তায় বাজার করা আর থাকার জায়গা। বিশেষ করে ছোট ছোট উপহার বা জামা-প্যান্ট কেনার জন্য থামেল চমৎকার। তারপর এলাম, কাঠমাণ্ডুর নিউ রোডে সুপার মার্কেটে। নিউ রোডে এত দোকান, বিদেশি জিনিসের এমন বিপুল আয়োজন যে কেমন যেন দিশেহারা লাগে। তবু কাঠমাণ্ডুতে বাজার করার অভিজ্ঞতা নিউ রোড ছাড়া সম্ভব নয়। স্টেশন থেকে এলাম ব্লু-বার্ড শপিং কমপ্লেক্স-এ। কাঠমাণ্ডুর অভিজাত মার্কেটে। এখানে দাম একটু বেশি। কিন্তু ঠকবার চান্স কম। পারফিউম, ঘড়ি, কাচের বাসন, জামা-কাপড়, পিকচার পোস্টকার্ড, এইসব কেনার জন্য ব্লু-বার্ড অদ্বিতীয়। ব্লু-বার্ডে বাজার করতে গেলে মনে হয় সত্যিই বিদেশে বাজার করতে এসেছি। কত রকমের চকোলেট, চিজ, ক্যানড ফুড!

বিকেল চারটেতে ভক্তপুর। কাঠমাণ্ডুর এত কাছে। তবু ভক্তপুর আজও মধ্যযুগের নেপালকে যেন ধরে রেখেছে ক্যাপসুলের মধ্যে। এখানকার জিয়াপু মেয়েরা এখনও ফ্ল্যামেনকো স্কার্টের মতো করেপরে কালো-লাল 'পাতাসি'। পাতাসি শেষ হয় হাঁটুর ওপরে। হাঁটুতে উল্কি। যা ছাড়া মেয়েরা সহজে স্বর্গে যেতে পারে না। ভক্তপুর নেপালি স্থাপত্যের স্বর্গ। ছাংগু নারায়ণের বিস্তৃত মন্দির চত্বর থেকে সাধারণ মানুষের বসতবাড়ি, কোনও কিছুর ওপরে আধুনিকতার কোনও ছাপ পড়েনি এখনও। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সমস্ত শহর জুড়ে শুধু প্যাগোডা। ভক্তপুরে ইট আর কাঠের জানলা। তুলনাহীন সৌন্দর্য। চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। রোম্যান্টিক রহস্য আজও যদি কোথাও থাকে, তা আছে ভক্তপুরে।

ভক্তপুর দেখে রওনা হলাম নগরকোটের পথে। সেখানকার সূর্যাস্ত জগৎবিখ্যাত। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় নগরকোটের রূপ বর্ণনার অতীত। নগরকোট যত কাছে আসছে তত বাড়ছে ঠাণ্ডা। সেই সঙ্গে কাছে সরে আসছে সারিবদ্ধ হিমালয়, লাংটাং হিমাল থেকে গৌরীশঙ্কর। সূর্যের শেষ আলোয় একে একে চোখের সামনে জ্বলে উঠল হিমালয় এক সার চূড়া। প্রথমে হলুদ তারপর উজ্জ্বল সোনালি। তারপর কমলা রঙের মেঘের গায়ে বেগুনি রঙের হিমালয়। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

চতুর্থ দিন ঃ ভোরবেলা যাত্রা শুরু। লাক্সারি বাসে ২০০ কিলোমিটার। প্রায় ৮ ঘণ্টার পথ। কিন্তু দু-ধারের পাহাড়-ঝরণা-অরণ্য-খাদ দেখতে দেখতে পিকনিকের মেজাজে কখন যে সময় কেটে গেল। পোখরা চলেছি আমরা। বাস থামিয়ে পথে ব্রেকফাস্ট। পোখরা পৌঁছে চমৎকার লাগল। পোখরার হোটেলটিও বেশ ভাল। জানলা থেকে দেখা যায় অন্নপূর্ণা আর ধৌলাগিরি। পোখরা না গেলে হিমালয়কে কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আমাদের হোটেল ফিউয়া লেকের ধারে। পাহাড়ের ছায়া বুকে ধরে রাখে পৃথিবীর এই বিখ্যাত লেক। লাঞ্চ খাওয়ার পর আজ আর কোনও কাজ নেই। শুধু বিশ্রাম আর আড্ডা। আর ইচ্ছে হলে ঠাণ্ডা বাতাসে হোটেলের সামনে একটু হেঁটে বেড়ান।

পঞ্চম দিন ঃ ভোরবেলা ডাক পড়ল। সূর্য উঠছে অন্নপূর্ণার মাথায়. রাঙা হয়ে গেছে আকাশ। অন্নপূর্ণার ওপর থেকে যেন নেমে আসছে লাল আলোর নদী। সেই ছায়া পড়েছে ফিউয়া লেকের জলে। সেখানে ভাসছে লাল আকাশ, লাল মেঘ, লাল হিমালয়। এই রোমান্স কি মর্ত্যে সম্ভব? তবু তা দেখলাম।

ভোরের আলোর মায়াডোর কাটতেই ব্রেকফাস্টের ডাক এল। ব্রেকফাস্টের পরেই এদিনের যাত্রা শুরু। দেখতে হবে ডেভিলস ফল। আর বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। এসব দেখার পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মনে হল, পোখরায় ফিউয়া লেকের ধারে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণার চূড়ায় সূর্যোদয় দেখলে সম্ভবত আর কিছু দেখার প্রয়োজন হয় না। পোখরায় আসা ওই একটি দৃশ্যেই সার্থক হয়ে যায়।

ষষ্ঠ দিন ঃ খুব সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পোখরা থেকে বেরিয়ে পড়া গেল ১৪৫ কিলোমিটার দূরে চিতওয়ান ন্যাশানাল পার্ক বা গায়দা ওয়াইল্ড লাইফ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। গভীর অরণ্যের এই রোম্যান্টিক অ্যাডভেঞ্চার-এর জন্য এক দিনে খরচ পড়ে মাথা পিছু তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। অথচ ভারতীয়দের জন্য এক্সটিক নেপাল এবার পুজোয় এই অ্যাডভেঞ্চার উপহার দিচ্ছে প্রায় বিনামূল্যে! লাঞ্চ করলাম গভীর বনের মধ্যে। রিভার ডিউ

শেষাংশ উনচল্লিশ পাতায়

পুজোয় প্যাকেজ ট্যুর

ভ্রমনপিপাসু বাঙালি বছরের প্রথমেই ক্যালেন্ডার হাতে পেলেই ঠিক করে ফেলেন, এ বছরটায় ছুটিতে কোথায় কাটাবেন। রাস্তা-ঘাট, গাড়ি-ঘোড়া, হোটেল্-মোটেল এ সবের হাজারো চিন্তা মাথায় ভিড় করে। অনেক সময় শান্তিপূর্ণ ভ্রমনসূচী অশান্তিতে পর্যবসিত হয়। তাই পরিবার, পরিজন বা একলা বেড়াতে গেলেও প্রয়োজন হয় গাইডের ও নিরাপত্তার। আর এই সব অসুবিধার কথা ভেবেই, বিভিন্ন ট্রাভেলস কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে, পর্যটকদের সুবিধার্থে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন প্রবীর চক্রবর্তী।



ঘরে-ঘরে ভ্রমণপিপাসু বাঙালি বছরের প্রথম থেকেই ক্যালেন্ডার হাতে পেলেই মনে মনে ভেঁজে ফেলেন বাৎসরিক বেড়াবার সূচিটি। এ বছর পুজোয় অবশ্য বাংলাদেশে বেড়াবার হুজুকটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে পর্যটকদের মধ্যে। এ ব্যাপারে ট্রাভেলস কোম্পানীগুলোও বেশ উঠেপড়ে লেগেছে। হলিউড ট্রাভেলস্ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করেছে বিমানে ও বাসে। ১১৫ ই লেনিন সরণিতে ওদের অফিস। এরা বাসে করে ৬/১০, ১৬/১০, ২১/১১, ২০/১২ তারিখে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। টেলিফোনে যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে ফোন নাম্বারটা জেনে নিনঃ- ২৪৬-২১০৫।

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, গোপালপুর, চাঁদিপুর, পুরী, শিমুলতলা, ঘাটশিলা, রাজগীর, শঙ্করপুর, দীঘায় বেড়াতে গেলে যোগাযোগ করুন ট্রাভেল পয়েন্ট (ইন্ডিয়া)-র অফিসে। এদের ঠিকানা ১৮ এ, পি, সি রোড, কলি-৯, ফোন- ৩৫০-২৭২৫/৩৫০-৯৫৩৪।

ভুটানে যাওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ডায়মন্ড ট্রাভেলস্-এর সঙ্গে। প্রকৃতির অপূর্ব হাতছানিতে ভরা থিম্পু, প্যারো এ ছাড়া সমগ্র হিমাচল প্রদেশ, পেলিং, পেমিয়াংসি, ইওকসাম, গ্যাংটক, দার্জিলিং, মিরিক, কাঠমান্ডু এবং কালিংপঙ ঘুরে আসুন। এদের ফোন- ২২৫-৯৬৩৯/২৭-৬৭১৪।

দিল্লি, আগ্রা, নৈনিতাল, মুসৌরী, হরিদ্বার ও হিমাচল প্রদেশ যেতে গেলে

পূর্বা ট্রাভেলস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এদের ঠিকানা ৪, চাঁদনী চক স্ট্রিট, দোতলায়। ফোন নম্বর ২৭-৭৪৭০।

আগামী ২২/৮, ২৭/৯, ১/১০ তারিখে যদি সাংলা, চিটকুল, তাবো, কাছা, মানালী, কল্পা যেতে চান তো যোগাযোগ করতে পারেন সাইলেন্ট ভ্যালী ১৪/১ কড়েয়া রোড, কলকাতা-১৭। এদের ফোনেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ফোন নাম্বার-২৮০-৭৮১১, এঁরা ৪/১০, ৭/১০, ১১/১০ তারিখগুলোতেও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া ১৪/৮, ২২/৮, ৭/১০ তারিখে ভিতরকণিকা ও লাক্ষাদ্বীপে ৭/১০, ১৩/১০ এ নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন।

লারিকা গ্রুপ এ বছর গ্যাংটক চাঁদিপুর, বক্রেশ্বর, গঙ্গাসাগর নিয়ে যাচ্ছে। লারিকা হোটেলে ভারতীয়, চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল খাবার পাবেন। যোগাযোগ করুন ৭৮, পার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা-১৭। এদের ফোন-২৪০-৩৫৮৩/৪৫৩৭।

পুরীতে মনোরম বাঙালি পরিবেশে থাকা খাওয়ার জন্য রয়েছে হোটেল রাজ। বুকিং করতে হলে ফোন করুন ২৯-৫৫৪৫/৪৮৩২, ৬৬৭-৮০৩৬।

কম খরচে হলিডে হোমের ব্যবস্থা করে দেবেন 'রিক'। মুকুটমনিপুর, দীঘা, পুরী দার্জিলিং, গ্যাংটকে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে যোগাযোগ করুন এদের সঙ্গে। এদের ফোন নাম্বার ৩৫০-৬২৬৩।

পুজোর ছুটিতে কেদার বদ্রী ২৫/৯ এ নৈনিতাল, রানীক্ষেত ৮/১০ ও ১৮/১০, ধরমশালা, ডালহৌসি সহ ১৯/১০ এ যেতে চানতো যোগাযোগ করুন ডিরানা ট্রাভেলস্ এর সঙ্গে। ২৫ বছর পূর্তিতে এঁরা কাউন্টার বুকিংয়ে বিশেষ ছাড় দিচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এঁদের সিটি অফিস ৩/১ ম্যাঙ্গো লেন (দোতলায়) কলি-১ এবং প্রয়োজন হলে এঁদের রেজিস্টার্ড অফিস ১৪৭/২ ফিডার রোড, কলিকাতা-৫৬ তে যোগাযোগ করতে পারেন। এঁদের ফোন নাম্বার ২৪৮-৭৯৫২, ৫৫৩-০৪৮৫।

কুন্ডু ট্রাভেলস্ অ্যান্ড ট্যুরস, কিন্নর কৈলাস, সিমলা, মানালি ২১/৯, ৮/১০ নিয়ে যাচ্ছেন। লাক্ষাদ্বীপে নিয়ে যাচ্ছেন ৯/১০, ৩১/১০ এ। মধ্যপ্রদেশে ২২/১০ আরাকু, বাস্তার, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ১৬/১০ এ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এবছর এঁরাও বাংলাদেশ ৫/১০, ১৬/১০ তারিখে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

এ ছাড়াও লে ৬/১০, অসম মেঘালয় ২৬/১০ ও আকর্ষণীয় উইক এন্ড ট্যুরেরও ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করুন ৫১ বি, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬৪-৮৩৮৭।

ইন্দোকালচার ট্যুরস্ গুজরাট, দিউ/হিমাচল ৩০/৯ এ পেলিং ইয়ুমথাং ৭/১০, রাজস্থান ১০/১০, হায়দ্রাবাদ, গোয়া, বোম্বে ১২/১০, নৈনিতাল, মায়ারতী, চকৌরি-১৭/১০, নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ১৮এ, বি সি জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৩। ফোন-২৪৯-৭৭৮৫/৪০৮৪/৭৮৮৪।

মনার্ক ট্যুরস ও ট্রাভেলস্ নৈনিতাল, কৌশানী, রাণীক্ষেত ১৭/৯, ১৮/১০, বিমানে কাঠমান্ডু ৬/১০, সিমলা, কুলু মানালী ১/১০, রাজস্থান ৭/১০, ১৯/১২, বম্বে-গোয়া ১৭/১০, ২৮/১২, দক্ষিন ভারত ৮/১০, ২৩/১২ নিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের ঠিকানা ১৫৬ এ, লেনিন সরণি, কমলালয় সেন্টার, কলিকাতা-১৩। দূরভাষ-২৭-৯৯১৭/৯৫০১।

পুজোর বুকিং শুরু করে দিয়েছেন ডলফিন ট্রাভেলস্, ২৬/২ এ শশীভূষণ দে স্ট্রিট কলিকাতা-১২ তে এঁদের অফিস। দূরভাষ-২২৭-৮৯৬৮। এঁরা এবছর পুজোয় ডালহৌসী ধরমাশালা সহ সিমলা, কুলু মানালী, রোটাং ৭/১০, ২০/১০; বিমানে কাঠমান্ডু, পোখরা ধুলিখেল ১০/১০,১৬/১০, কেদার নাথ, বদ্রীনাথ ২৯/৯, রাজস্থান ৮/১০, ১০/১০, হায়দ্রাবাদ, ভাইজ্যাক-১২/১০, তুষার তীর্থ অমরনাথ ১/৮ ও এই মাস থেকে কাশ্মীর ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন।

না হেঁটে মানস-কৈলাসে যেতে চান তো তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন সমীর রায়ের সঙ্গে। এঁনার ফোন নম্বর ৩২১-৮১৬৩। আগামী মাসেই মানস যাত্রার চতুর্থ পদক্ষেপ নিয়েছেন সমীর বাবু। এছাড়াও কন্তুতীর্থ ও ভ্রমণ ১৬/১০, কেদার বদ্রী ও ১৯/৯ এ নিয়ে যাচ্ছে। যোগাযোগ-৭,এ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, ফোন-৪৪০-৫৩৯০।

শ্রদ্ধাঞ্জলী ট্রাভেলস এবারের পুজোয় চোদ্দ দিনের জন্য ২০/৯ তারিখ থেকে কেদার বদ্রী যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া ৮/১০ থেকে বারো দিনের জন্য সিমলা, মানালী, ও ১৭/১০ ষোল দিনের জন্য সিমলা, মানালী ধরমশালা ডালহৌসী, রাজস্থান-গুজরাট ৮/১০, ১০/১০ (২০দিন), দক্ষিণ ভারত ৯,১১/১০ থেকে কুড়ি দিনের জন্য, বম্বে-গোয়া, মহাবালেশ্বর ৮,১৭/১০ ষোল দিনের জন্য। নৈনিতাল রানীক্ষেত, কৌশাণী ৭,১৯/১০ (বারো দিনের জন্য); মধ্যপ্রদেশ ৭,১৪/১০ (১৭দিনের)। যোগাযোগ—কোলেপাড়া তালপুকুর, ব্যারাকপুর। দূরভাষ-৫৬০-১৫৫৬, ৭৭০৮, কলকাতা অফিস ১০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলি-১ (২৪৮-৩৯৪০)।

লিঙ্কেজ হিমাচল প্রদেশ (১৪দিন), রাজস্থান (১৮দিন), দক্ষিণ ভারত (২১দিন), সিকিম-কালিংপঙ, লাভা (১১দিন) ছাড়াও গ্যাংটক, পেলিং সিমলা, মানালী, দার্জিলিং, লাভা, দীঘা, পুরীতে নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করেছে। এদের ফোন—২৪৪-৮০৮৭, ৩৩৭-৯৯৭০

পিয়ারলেস ট্রাভেল প্রাঃ লিমিটেড, ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলি-৬৯। ১, ৮, ১৬, ২৮ অক্টোবর সিমলা মানালী, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবেন। এছাড়া আন্দামান, কাঠমান্ডু ও ভুটান প্যাকেজস ট্যুরের ব্যবস্থা করেছে। যোগাযোগের জন্য ফোন—২৪৮-৭১৮১, ২৪৮-৭১৯৭।

১৯৩৩ সাল থেকে কুন্ডু স্পেশাল পর্যটকদের কাছে বিশেষ পরিচিত নাম। এ বছর পুজোয় বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা হরিদ্বার সহ উত্তর ভারত ১৪/৮, রামেশ্বর-কন্যাকুমারী সহ দক্ষিণ-ভারত ২২/৮/,৫/৯/,১৯/৯, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, হেমকুন্ড বদ্রীনারায়ণ ২৪/৮, নগরকোট সহ কাঠমান্ডু পোখরা (বিমান) ৬/৯, ২৬/৯, ডালহৌসী, ধরমশালা, বৈষ্ণবদেবী, জ্বালামুখী, অমৃতসর ১৫/৯, সিমলা, কুলু, মানালী, রোটাং পাস ১৬/৯, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কৌসাণী আলমোড়া ১৭/৯, অক্টোবর নভেম্বরের ট্যুরের জন্য বুকিং চলছে। যোগাযেগের ঠিকানা, ১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। ফোন—২৭-১৭৮৫/৬৭৬৭; ৪০/১ স্ট্রান্ড রোড, ২৪৩-১২৪৭ শ্রীপতিভবন, হিন্দুস্তান পার্ক, ৪৬৪-১২২২।

আপনি কি মনে মনে ঠিক করছেন যে, এ বছর পুজোয় যাবেন নেপালে। তাহলে আর দেরি নয়। এখনই যোগাযোগ করুন, এক্সটিক ডেস্টিনেশন্স প্রাইভেট লিমিটেডের, অসিত চৌধুরির সঙ্গে। যোগাযোগের ঠিকানা— কমলালয় সেন্টার। ১৫৬/এ, লেনিন সরণি, রুম নং এফ ৫৮(দোতলায়) ফোন-২৬-৮৯২৩ ফ্যাক্স নং-২৬৪১৫২ কাঠমান্ডুতে যোগাযোগ ঃ মাইতি ঘর, কাঠমান্ডু ফোন-২৪-৬৬৯৪/২৪৪৯১২ ফ্যাক্স-২২২৯৪০।



ছবি : গৌতম রায়

তৃণমূল মানে মূলস্রোত : মমতা

রাজ্য কংগ্রেসের সুখী মিত্র পরিবারে ভাঙন ধরিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদেশ নেতৃত্ব বিপর্যস্ত, হাইকম্যাণ্ড বিব্রত এবং বামফ্রন্ট আপাতত স্বস্তিতে। মমতা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জয়ললিতা হতে চলেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিতে তাঁর আগামী কাজ-কর্মের কিছুটা হদিশ পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : আপনি কংগ্রেসে থেকেও তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি গড়লেন কেন?

মমতা : ওদের (প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি) সিপিএমের বিরুদ্ধ কোনও আন্দোলন নেই ওরা সিপিএমের সঙ্গে আঁতাত করেছে। আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি.পি.এম. কে উৎখাত করা। সেই লক্ষ্যেই এই তৃণমূল কমিটি গড়া হয়েছে। কাজ করবার জন্য আলাদা সেট আপের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন : তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি গড়ার মধ্য দিয়ে আপনি কি নতুন দল গঠনের দিকে একধাপ এগিয়ে গেলেন?

মমতা : নতুন দল গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। আমরাই আসল কংগ্রেস, এটাই কংগ্রেসের মূলস্রোত। তা প্রমাণ করে দেব। আমরা কংগ্রেসের ভিতরে থেকে লড়তে চাই। তেরঙ্গা ঝান্ডা ছাড়ছি না।

প্রশ্ন : তৃণমূল কংগ্রেসের ১২০ জনের স্টিয়ারিং কমিটির নাম আপনি ঘোষণা করেছেন বেশ কিছু জেলায় যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। আপনার শিবিরের ক্ষোভ চাপা দিতেই কি এতবড় কমিটি ও জেলায় যুগ্ম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?

মমতা : মোটেই না প্রাবীন ও নবীনদের জায়গা করে দিতেই এত বড় স্টিয়ারিং কমিটি গড়া হয়েছে। আর জেলায় যুগ্ম আহ্বায়করা সাংগঠনিক নির্বাচন পরিচালনা করবেন। আমরা ড্রয়িংরুমে বসে কমিটি করব না। এই স্টিয়ারিং কমিটি ব্লক থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি গঠন করবে।

প্রশ্ন : এই সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামবেন কি?

মমতা : কংগ্রেসের সদস্য তালিকা অনুসারে এই নির্বাচন হবে। নতুন সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরাই তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হতে চান, তাদের সদস্য করা হবে।

প্রশ্ন : আপনি স্টিয়ারিং কমিটির কোনও পদে নেই কেন?

মমতা : আমি স্ট্যাম্পিং প্যাড হতে চাই না। লাখো লাখো তৃণমূলস্তরের কংগ্রেস কর্মীর মত আমি প্রাথমিক সদস্য হয়ে থাকতে চাই।

প্রশ্ন : আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে আপনি বলেছেন। তাদের 'প্রতীক' কি হবে?

মমতা : সে নির্বাচন এলে দেখা যাবে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের চ্যালেঞ্জ শুরু। 'সব কটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে' তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জিতবেন।

প্রশ্ন : কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী আপনার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। তাহলে কি আপনি ডিসেম্বরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নিজেই দল ভাঙার ঘোষণা করবেন?

মমতা : দেখা যাক কি হয়। আমার এটাই দাবি, তৃণমূলস্তরের কর্মীদের ন্যায্য সম্মান দিতে হবে। প্রদেশ কংগ্রেসকে 'অ্যাড-হক' ঘোষণা করতে হবে। আমাদের 'স্টান্ড' থেকে আমরা সরছি না। মাথাও নত করব না, তবে সি. পি. এমের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে সম-মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে বাংলা বাঁচাও ব্লক' তৈরি হবে। আমাদের স্লোগান সি. পি. এম. হঠাও বাংলা বাঁচাও

সাক্ষাৎকার সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

৫০ বছর ঃ ভাগ্যের সঙ্গে অভিসার

১৯৪৭ ঃ ১ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীন আইন গৃহীত।
১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশের সৃষ্টি।
২২ অক্টোবর পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কাশ্মীর আক্রমণ। কাশ্মীরের ভারতে যোগদান।
২৭ অক্টোবর কাশ্মীরে ভারতীয় ফৌজ।

১৯৪৮ ঃ ৩০শে জানুয়ারি দিল্লিতে আততায়ীর হাতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।

১৯৪৯ ঃ ২৬ নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান অনুমোদিত।

১৯৫১ ঃ ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

১৯৫২ ঃ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

১৯৫৩ ঃ হিন্দি চিনি ভাই ভাই। ভারত চীনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি।

১৯৫৫ ঃ আবাদি কংগ্রেস। সমাজতান্ত্রিক ধাচের সরকার গড়া লক্ষ্য ঘোষিত।

১৯৫৬ ঃ জীবন বিমা জাতীয়করণ। তামিলনাড়ু ভেঙে অঙ্গরাজ্য গঠিত। রাজ্য পুণর্গঠনের জন্য আইন গৃহীত।

১৯৫৭ ঃ দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। রাজেন্দ্র প্রসাদ দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতি।

১৯৫৮ ঃ ভারতে ওজন ও পরিমাণের জন্য মেট্রিক পদ্ধতি গৃহীত।

১৯৫৯ ঃ চক্রবর্তী রাজা গোপাল আচারি প্রমুখের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র পার্টি গঠিত।

১৯৬০ ঃ গুজরাতকে স্বতন্ত্র রাজ্য ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন। বোম্বাই ভেঙে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত।

১৯৬১ ঃ গোয়ার ভারত ভুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা। পুলিশি অভিযান চালিয়ে গোয়া দমন ও দিউর ভারত ভুক্তি।

১৯৬২ ঃ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। রাষ্ট্রপতির পদে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। ১৯শে সেপ্টেম্বর চীনের ভারত আক্রমণ।

১৯৬৩ ঃ স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন। বহু স্বর্ণকারের আত্মহত্যা। নাগাল্যাণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত।

১৯৬৪ ঃ ২৭শে মে ভগ্ন হৃদয় নেহরুর মৃত্যু। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী। ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হল। সি পি আই ও সি পি আই এম গঠিত।

১৯৬৫ ঃ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ৩০শে জুন যুদ্ধ বিরতি।

১৯৬৬ ঃ তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আয়ুবখানের মধ্যে বৈঠক। পাক-ভারত চুক্তি। ১১ই জানুয়ারি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে মৃত্যু। ২৩শে জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত। ২৪ জানুয়ারি বিমান দুর্ঘটনায় বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জে ভাবার মৃত্যু।

১৯৬৭ ঃ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন, ১৭ই জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী। জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ১ নভেম্বর স্বতন্ত্র রাজ্য হরিয়ানা গঠিত।

১৯৬৮ ঃ হর গোবিন্দ খুরানার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (১৬ই অক্টোবর)।

১৯৬৯ ঃ ১৪ই জুলাই ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ। ২৪শে আগস্ট চতুর্থ রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির শপথ।

১৯৭১ ঃ লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন। ১৩ই মে সাধারণ বিমা জাতীয়করণ। মার্চ মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি যুদ্ধ শুরু। উদ্বাস্তু আগমণ। ভারতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু। ভারতীয়

সৈন্য ও বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর যৌথ ঢাকা অভিযান। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা মুক্ত। পাকিস্তানি সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ।

১৯৭২ ঃ এপ্রিল জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে চম্বলের ডাকাতদের আত্মসমর্পণ।

১৯৭৩ ঃ বিচারপতি অজিত নাথ রায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত। প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতি পদত্যাগ।

১৯৭৪ ঃ জয়প্রকাশের গণতন্ত্র আন্দোলন। রাজস্থানের পোখরাণে পরমাণবিক বিস্ফোরণ।

১৯৭৫ ঃ ১৭ এপ্রিল ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মৃত্যু। ১৯শে এপ্রিল প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যাবর্ত উৎক্ষিপ্ত। ২৫শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণা। জয়প্রকাশ সহ বিরোধী বহু নেতা গ্রেফতার।

১৯৭৬ ঃ ১ এপ্রিল দূরদর্শনের জন্ম। ২৯শে এপ্রিল নজরুল ইসলামের ঢাকায় মৃত্যু।

১৯৭৭ ঃ ১৮ জানুয়ারি লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল। ২০শে জানুয়ারি জনতা পার্টির জন্ম। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা। ২রা ফেব্রুয়ারি ইন্দিরা মন্ত্রিসভা থেকে জগজীবনের পদত্যাগ। ২১শে মার্চ আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। জনতা পার্টির ক্ষমতা লাভ। ২৪শে মার্চ মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী। ২৫শে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হন সঞ্জীব রেড্ডি।

১৯৭৯ ঃ ২৮শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ। জনতা পার্টিতে ভাঙন। চরণ সিং এর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার। ১০ই আগস্ট ভারতের প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যন্ত্র থেকে উপগ্রহ প্রেরণ। ৮ই অক্টোবর জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু। ২৭শে অক্টোবর মাদার টেরেসার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৮০ ঃ ১০ই জানুয়ারি নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ২৩শে জুন বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু। ২৪শে জুন ভিভি গিরির মৃত্যু।

১৯৮১ ঃ ৫ই আগস্ট জগজীবন রামের নেতৃত্বে কংগ্রেস (স) গঠিত।

১৯৮২ ঃ ২৫শে এপ্রিল ভারত রঙিন টিভির যুগ শুরু। ৯ই সেপ্টেম্বর শেখ আবদাল্লার মৃত্যু।

১৯৮৩ ঃ ৩১শে আগস্ট ইনস্যাট বি উৎক্ষিপ্ত।

১৯৮৪ ঃ ৪ এপ্রিল, ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার সোভিয়েত নভোচারীদের সঙ্গে কক্ষ পথে ভ্রমণ। ৩রা ডিসেম্বর ভূপালে গ্যাসলিকের ফলে ৩ হাজার ব্যক্তির মৃত্যু। ৫০ হাজার আহত। ৩১শে ডিসেম্বর আততায়ীর হাতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু। ২৪—২৮শে ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮৫ ঃ ২৩শে জুন দলছুট বিরোধী আইন পাশ। ২৩শে জুন আটলান্টিক সমুদ্রের উপর কণিষ্ক বিমান ভেঙে ৩২৯ জনের মৃত্যু।

১৯৮৬ ঃ শাহবানু মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ই মে মুসলিম মহিলাদের অধিকারে সঙ্কুচিত করে বিল পাশ। ৯ই মে তেনজিং নোরকের মৃত্যু।

১৯৮৭ ঃ ২৫শে জুলাই আর বেঙ্কটরামণ ভারতের অষ্টম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। ৩০শে জুলাই শ্রীলঙ্কায় আই পি কে এফ এর অবতরণ, ৫ই সেপ্টেম্বর রাজস্থানের গ্রামে সতী হল রূপ কানোয়ার।

১৯৮৮ ঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রথম সরফেস টু সারফেস মিসাইল অগ্নি উৎক্ষিপ্ত।

১৯৮৯ ঃ ৬ই জানুয়ারি ইন্দিরা গান্ধীর দুই হত্যাকারি সতবন্ত ও কেহরের ফাঁসি। অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। ২রা ডিসেম্বর জনমোর্চার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভি পি সিংয়ের শপথ গ্রহণ।

১৯৯০ ঃ ৭ই আগস্ট, অনগ্রসরদের জন্য ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষণ ঘোষণা। ২৩শে অক্টোবর ভিপি সিংহ সরকারের উপর থেকে বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহার। ৭ই মে আস্থাভোটে ভিপি সিংহ সরকারের পরাজয়। ১০ই মে চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সমর্থিত মন্ত্রীসভা।

১৯৯১ ঃ ৬ই মার্চ, প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের পদত্যাগ। ১৩ই মার্চ লোকসভা বাতিল। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা। ২১শে মে রাজীব গান্ধী নিহত। ২১শে জুন নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় লাভ। দশম প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এর শপথ গ্রহণ।

১৯৯২ ঃ ৩০শে মার্চ সত্যজিৎ রায়ের আস্কার পুরস্কার। ২৫শে জুলাই, নবম রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার শপথ। ১০ই অক্টোবর কলকাতায় দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর উদ্বোধন। ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস।

১৯৯৩ ঃ ১২ই মার্চ বোম্বাই ব্লাস্ট, ৩০০ নিহত, ১৬ই মার্চ বউবাজার ব্লাস্ট, ৭০ জন মৃত। ১৬ই জুন হর্ষদ মেহতার ঘোষণা তিনি প্রধানমন্ত্রী রাওকে ১ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্পে ২১ হাজার নিহত।

১৯৯৪ ঃ ১৫ এপ্রিল ভারতের গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর। সুস্মিতা সেনের বিশ্বসুন্দরী খেতাব লাভ (২১শে মে)। সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রে প্লেগ।

১৯৯৬ ঃ ১৬ই জুন হাওয়ালা মামলায় সিবিআই এর ৭ জন রাজনীতিককে চার্জশিট। ৫ই মে ভারতের সাধারণ নির্বাচন বিজেপির একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা। অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ। ২৮শে মে সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখাতে না পারায় অটলের পদত্যাগ। কংগ্রেসের সমর্থনে দেবগৌড়ার প্রধানমন্ত্রীত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার। ১২ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেস জলচুক্তি।

১৯৯৭ ঃ ৩০শে মার্চ যুক্তফ্রন্টের ওপর থেকে কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহার। কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট আই. কে. গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়।

ডায়ানার মৃত্যু ঃ দুর্ঘটনা না অন্যকিছু?

প্যারিসের টানেলে ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন রাজকুমারী ডায়ানা। আর্ত মানুষের বন্ধু, মানসিক আঘাতে জর্জরিত ডায়ানা ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বজুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। রক্ষণশীল রাজপরিবারে ডায়ানা ছিলেন এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। জন্মেছিলেন সোনার চামচ মুখে ১৯৬১ সালের ১ জুলাই, নরফোক এর বিখ্যাত স্পেনসার পরিবারে, পৃথিবীর সুন্দরীতমাদের একজন হয়েও, সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য, বুদ্ধি, বাকপটুতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'জনতার যুবরাণী'। রাজকুমারীর বর্ণময় জীবন নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লিখেছেন—প্রবীর চক্রবর্তী



ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, রূপ, লাবণ্য, প্রেম ও রাজকীয়তার কিংবদন্তী যেন রূপকথার রাণী, জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার আগেও রেখে গেলেন এক অন্তিম আভিজাত্য। কোটি কোটি পুরুষের মনে একরাশ তুফানের মক্ষিরাণী আলোক-চিত্রীদের চোখ এড়াতে, প্যারিসের টানেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ যেন বাঁচতে গিয়ে মরণের ঝাঁপ। আর সেই সঙ্গে রাজকুমারীকে ঘরণী করার স্বপ্ন বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থেকে গেল ডায়নার সঙ্গী ডোডিওর। একই সঙ্গে মৃত্যুর দেশে পাড়ি দিলেন দুজনেই। আইফেল টাওয়ারের কাছে রিৎজ হোটেলে ডিনার সেরে একটা গাঢ় নীল রঙের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে বন্ধু ডোডি আল্ ফায়েদের সঙ্গে ফেরার পথেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেইন নদীর ধারের টানেলে তখন ডায়ানার গাড়ির গতি ঘন্টায় ১০০ থেকে ১৬০ কি.মি.। পেছনে দৌড়চ্ছে ফটোগ্রাফারের দল। একটু রঙিন ছবির অপেক্ষায়। এ যেন সুন্দরবনের হিংস্র রয়েল বেঙ্গলের দল ছুটছে বনের সোনার হরিণটিকে শিকারের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত কাজল নয়না হরিণীর, প্রেম, রহস্য, উদ্দামতার যবনিকা পতন ঘটল মুহূর্তের মধ্যে। যেন এক বাঁধ ভাঙা ঢেউ, সবকিছু শেষ করে দিয়ে গেল চোখের পলকে। 'জনতার যুবরাণীর' অন্তিম যাত্রা। একদিকে প্রেমিকের উষ্ণ সান্নিধ্য, মোমবাতির আলোমাখা পরিবেশে নৈশভোজ, বিলাস বহুল সেইন নদীর পাড়ে বাগান বাড়িতে অবকাশযাপন, সবই দুঃস্বপ্নের মতো শেষ হল জীবনের মাত্র ছত্রিশটি বসন্তে।

ফ্রান্সকে ভালবাসতেন ডোডিও। আর ডায়নার বরাবরই পছন্দ ছিল ফরাসি দেশে ছুটি কাটানোর ব্যাপারে। সত্তরের দশকের শেষে যে জীবনের সূচনা, নব্বই এর দশকের শেষে হল তার অবসান। তবে নিঃসন্দেহে এ এক রাজকীয় মৃত্যু। দুর্ঘটনাই এই রাজকীয় মৃত্যুর অন্যতম কারন। কেননা এই ড্রিম গার্ল ডায়ানা এক সাক্ষাৎকারে (বি. বি. সি. তে দেওয়া) গলা তুলে বলেছিলেন, 'বৃটেনের রাজতন্ত্রের ঘুণ ধরা অনেক কাহিনীই আমি অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশে নিয়ে আসবো।' রক্ষণশীল রাজপরিবারে ডায়না ছিলেন বাস্তবিকই এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাই রাজবাড়িতে থেকেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'সাধারণ মেয়ে'। 'প্রিন্সেস অফ ওয়েলস' বলে তাঁর এতটুকু অহংকার ছিল না। আভিজাত্যের বড়াই করে নিজেকে কোনদিনও জাহির করতে চান নি। পার্থিব বৈভব যেন ছিল তাঁর কাছে জীবনযন্ত্রনা, ব্রিটিশ রাজপরিবারের আর কোন কন্যা বা বধূ উন্মুক্ত পোশাকে রাস্তায় বেড়িয়ে পরার সাহস দেখাতে পারেন নি। এখানেই ডায়ানার বিশেষত্ব। রক্ষণশীলতার রুক্ষ শেকল ছিঁড়ে মুক্ত অঙ্গনে এভাবে বেড়িয়ে পরার উজ্জ্বল নিদর্শন 'ডায়ানা' ছাড়া আর কোন যুবরাণীর কি সম্ভব? তাইতো জীবনের শেষ মুহূর্তটিতেও ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা। ডোডিও যেন সেই ট্রাজেডির অন্যতম নায়ক। রাজকুমার উপাধি না পেলেও জীবনের শেষ সঙ্গিনী রাজকুমারীর সঙ্গে যেন সহমরণে চলে গেলেন মহম্মদ আল ফায়েদের ছেলে ডোডিও। আর ডায়ানা, শৈশবের হাসি খুসিতে উচ্ছল, উজ্জ্বল দিনগুলি পেরিয়ে যখন পৌছলেন যৌবনে, মাত্র কয়েকটা দিন কাটলো আনন্দে-উচ্ছ্বাসে, তারপরই ঘটল বিচ্ছেদের সুর, দানা বাঁধলো মানসিক যন্ত্রনা। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ডায়ানা হয়ে উঠলেন বিশ্বজুড়ে বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু।

আজ আর যন্ত্রনা নেই, বিতর্কের অবসান ঘটলো। ১৯৮১-র ২৯ জুলাই সেই বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুড়ি বছরের নববধূ ডায়ানার শান্ত, স্নিগ্ধ চুম্বন কি যুবরাজ চার্লসের মনে পড়ছে না? . স্কটল্যান্ডের বাল মোরাল ক্যাসেল্-এ ভোরের আলো ওঠার আগে পনের বছরের ছেলে উইলিয়ম ও প্রায় তেরো বছরে পা দেওয়া হ্যারিকে ঘুম থেকে তুলে তাদের মায়ের মৃত্যুর খবর যখন দিলেন চার্লস তখন কি চার্লসের একটুও মনে পড়েনি পুরোনো সেই দিনের কথাগুলি? অন্ধকার তখনও কাটেনি। লন্ডন শহরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে ডায়ানার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ। ১৯৯২ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি মাত্র পাঁচ ঘন্টার জন্য এসেছিলেন কলকাতাতেও। আর্ত মানুষের সেবাতেই এসেছিলেন মহানগরীতে। সংক্ষিপ্ত সফরেই জয় করেছিলেন মানুষের হৃদয়। আসছে বছরও আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু কলকাতার মানুষের দুভাগ্য যে, আর তাঁর আসা হবে না। কিন্তু সত্যিই কি এটা দুর্ঘটনা? চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে মিশর। বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেই মামলা রুজু করবেন, বলে ডোডির বাবার কৌসুলি বার্ণার্ড ডার্টেভেলে ফরাসি টিভিতে নাকি জানিয়েছেন। এদিকে কাঠগড়ায় পাপারাৎজি সহ আটক সাত আলোকচিত্রী। বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড়টি কিন্তু বর্তেছে আলোক চিত্রীদেরেই ওপর। ডায়ানার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি তোলার জন্য যাঁরা এক মুহূর্তও পিছু ছাড়েননি, তাঁরা হলেন আলোক চিত্রীর দল। কিন্তু সত্যিই কি আলোকচিত্রীদের ভয়েই এই দুর্ঘটনা? এর মধ্যে কি কোন চক্রান্ত নেই? কিন্তু ব্রিটেনে মিশরীয় ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তো রয়েছে। ডোডি-ডায়ানার প্রেম পর্ব শুরু হওয়া থেকেই তো জাতিবিদ্বেষী অনেক মন্তব্য ওদের সহ্য করতে হয়েছে। তাহলে কি এই মৃত্যুর পেছনে কোন চক্রান্ত রয়েছে বলে অনুমান করা কি খুব ভুল হবে? বোধ হয় সামান্য হলেও, একটু গন্ধ রয়েছে। তাই শুধু বিচার বিভাগীয় তদন্তের অপেক্ষা! তখনই বোঝা যাবে এটা কি দুর্ঘটনা না অন্য কিছু?

ডায়ানার বর্ণময় জীবনের অবসান ছত্রিশটি বসন্তে [১৯৬১—১৯৯৭]

১ জুলাই ১৯৬১ লর্ড ও লেডি আলথর্পের তৃতীয় সন্তান লেডি ডায়ানা ফ্রান্সেস স্পেনসারের জন্ম।

১৯৭৭ ঃ আলথর্পে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে প্রথম দেখা।

১৯৮০ ঃ চার্লস ডায়ানার প্রেমে পরিপূর্ণতা।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ ঃ চার্লসের সঙ্গে ডায়ানার বাগদান ঘোষণা হয়।

২৯ জুলাই ১৯৮১ ঃ ডায়ানা বিয়ে করলেন যুবরাজ চার্লসকে। বিয়ে হয় সেন্ট পলর্স ক্রাথিড্রালে।

২১ জুন ১৯৮২ ঃ চার্লস ডায়ানার প্রথম সন্তান প্রিন্স উইলিয়াম আর্থার ফিলিপ লুইসের জন্ম।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ঃ ছোট ছেলে হেনরি চার্লস অ্যালবার্ট ডেভিডের জন্ম।

১৯৮৫ ঃ বিবাহে সমস্যার সূত্রপাত।

১৯৮৬ ঃ প্রকাশ্যে একসঙ্গে কাজ করলেও, ব্যক্তিগত জীবনে চার্লস ডায়ানার বিচ্ছিন্নতা শুরু।

১৫ জুন ১৯৯২ ঃ অ্যানড্রুই মর্টনের বই 'ডায়ানা ঃ হার ট্রু স্টরি' প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় চার্লস এর সঙ্গে বিবাহিত ক্যামিলা পার্কারের দীর্ঘদিন ধরে প্রণয় পর্ব চলছে। এই খবর কানে যেতেই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন ডায়ানা।

২৫ অগস্ট ১৯৯২ ঃ ডায়ানা ও জেমর্স পিলবির ফোনালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৯২ (নভেম্বর) ঃ দক্ষিণ কোরিয়া সফরেই স্পষ্ট হয় চার্লস ডায়ানার তিক্ততা।

৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ ঃ বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ঘোষণা করেন চার্লস—ডায়ানা আলাদা ভাবে জীবনযাপন শুরু করেছেন।

১২ জানুয়ারি ১৯৯৩ ঃ ক্যামিলা ও চার্লসের ফোনালাপ প্রকাশ পায়। 'সান পত্রিকায়'।

২৯ জুন ১৯৯৪ ঃ চার্লস এক টিভি তথ্য চিত্রে জানান বিয়ে ভেঙে যাবার পর তিনি প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছেন।

১৯৯৪ (সেপ্টেম্বর) ঃ অ্যানা পাস্তারনাকের 'প্রিন্সেস ইন লাভ' প্রকাশিত হয়। এই বইটিতেই অশ্বারোহণ প্রশিক্ষক জেমস হিউইট এবং প্রিন্সেস অব ওয়েলসের প্রেমের কথা প্রথম জানাজানি হয়।

২০ নভেম্বর ১৯৯৫ ঃ একটি টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে ডায়ানা শিকার করেন, হিউইটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ঃ চার্লসকে ডিভোর্সে রাজি হন ডায়ানা।

১২ জুলাই ১৯৯৬ ঃ ডিভোর্সের শর্তে দুজনেই রাজি হন।

১৩ জুলাই ১৯৯৬ ঃ ডায়ানা কেঁদে ফেলেন ডিভোর্সের বেদনায়।

২৮ অগস্ট ১৯৯৬ ঃ পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে ডিক্রি হয়।

২৫ জুন ১৯৯৭ ঃ ডায়ানার একটা গ্রাউন নিলামে বিক্রি হয় বত্রিশ লক্ষ ডলারের বেশি দামে।

৭ অগস্ট ১৯৯৭ ঃ ডোডি আল-ফায়েদ ও ডায়ানার নতুন প্রেমের খবর প্রকাশ পায়।

২২ অগস্ট ১৯৯৭ ঃ ডোডির সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে অবকাশ যাপন শুরু।

৩১ অগস্ট ১৯৯৭ ঃ প্রেমিক ডোডি ফায়েদের সঙ্গে প্যারিসে ভ্রমণ ও সেখানেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

কেউ কিছু দেখেনি



বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী না পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। রাজ্যের মানুষ এখন সমাজবিরোধীদের ভয়ে এতখানি আতঙ্কগ্রস্ত, যে চোখের সামনে কোনও ঘটনা ঘটলেও মুখ খুলছেন না কেউই। এই আতঙ্কগ্রস্ত সমাজ সম্পর্কে প্রতিবেদনটি লিখেছেন— হীরক কর।

তপন সিংহের 'আতঙ্ক' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চয় সেই দৃশ্যটি মনে আছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় মাষ্টারমশাই দেখেছিলেন তাঁর ছাত্ররাই একটি লোককে খুন করছে।

মস্তানদের একজন মাষ্টারমশাইকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, 'মাষ্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি'। একদিকে মুক্ত বিবেকবোধের তাড়না অন্যদিকে তাঁর নিজের ও তাঁর মেয়ের নিরাপত্তা, এই দুই এর টানা-পোড়েনে, উদ্‌ভ্রান্ত মাষ্টারমশাই-এর আতঙ্ক ওই ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিচালক। ওই আতঙ্ক একটি গোটা জাতির নৈতিক অসাড়তার প্রতীক, সেই আতঙ্ক যে আজও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাটেনি, বরং যত দিন যাচ্ছে, ততই তাকে অজগরের মত পেঁচিয়ে ধরছে, রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিই তার প্রধান দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের এখন ভিড় ট্রেনে, জনবহুল স্টেশনে, বাসের ভিতর, অথবা যে কোন প্রকাশ্য স্থানে, দুবৃত্তরা মানুষকে খুন করে, কেউ কিছু দেখে না। জনবহুল রাস্তায় সকলের চোখের সামনে মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই হয়ে যায়, সে ঘটনারও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায় না। অথচ, প্রত্যক্ষদর্শী নাগরিকের সৎ এবং নির্ভীক শনাক্তকরণের ওপর নির্ভর করে আসামীর গ্রেফতার ও সাজা। কিন্তু কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বক্তব্য, বড় ঘটনা ঘটলে এখানে কদাচ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায়। এইতো গত ১২ আগস্ট, মুম্বাই-এর আন্ধেরীতে গুলশান কুমারকে যখন মাফিয়ারা গুলি করে মারছিল, তখন বাঁচবার জন্যে গুলশান কুমার যে বাড়িতেই আশ্রয় নিতে

যাচ্ছিলেন, সেই বাড়ির দরজাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জীবনের মায়া তুচ্ছ করে মিস ডি, সুজা নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলেন আততায়ীদের চেহারার বিবরণ। আর ওই বিবরণের ভিত্তিতেই পুলিশ ধরে ফেলেছিল আততায়ীদের। কিন্তু কলকাতার চলন্ত ট্রেনের ভেতর যেদিন খুন হলেন কালিপদ সরকার, সেদিন কোন মিস ডি, সুজাকে পাওয়া গেল না। ভিড় কামরার যাত্রীদের কেউ নাকি কিছু দেখেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে একের পর এক ঘটনা সাজানো যাক ঃ

দৃশ্য—১

বুধবার, ২৩ জুলাই। বেলা সাড়ে ১২ টা। চলন্ত এন-৭৩-আপ নৈহাটি লোকাল। বেলঘরিয়া থেকে ভিড় ট্রেনটি ছাড়তেই তিনজন যুবক ট্রেনে ওঠে। চালকের কেবিন থেকে তৃতীয় বগিতে (১০৯৮৬) দাঁড়িয়েছিল কালো নেটের স্যান্ডো গেঞ্জি আর ছাই রঙের ট্রাউজার পরা যুবকটি। এই তিন যুবক তাকে ঘিরে ধরে। প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তারপর গুলি করে। একটি গুলি লাগে যুবকটির বাঁ কাঁধে। দমদম ও সোদপুর স্টেশনের মাঝে হত্যাকান্ডটি ঘটে। আগরপাড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে আততায়ী যুবকেরা নেমে যায়। নিহত যুবকের সারা গায়ে চিহ্নিত নীল কালির উল্কিতে 'বাঁকা হীরা' মামনি, ওঁ প্রত্যক্ষ করা ছাড়া পুলিশ কিছুই জানতে পারেনি। এমনকি ঘটনায় গুলি ঠিক কখন চলেছিল কামরার যাত্রীরা পুলিশকে জানাতে পারেনি। যাত্রী বোঝাই কামরায় এই খুনের ঘটনা ঘটলেও বিস্ময়করভাবে একজনও 'প্রত্যক্ষদর্শী' পাওয়া যায়নি। ট্রেনের মধ্যেই যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার হদিস সোদপুর স্টেশনে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ জানতে পারেননি। সোদপুর স্টেশনে অফিসাররা যখন জানতে পারেন তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। টিটাগড় স্টেশনে পৌঁছলে শুরু হয় তল্লাশি। দমদম জি. আর. পি. থানার ওসি হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'কামরার মধ্যে খুনের ঘটনা ঘটতে দেখে আতঙ্কে যাত্রীরা সবাই এই কামরা থেকে নেমে যান। ফলে পাওয়া যায়নি 'প্রত্যক্ষদর্শী'।

দৃশ্য—২

খুন হলেন 'জ্যাঠামশাই'। সি পি এমের রাজ্য কমিটির হিসাবরক্ষক তথা প্রকাশক ছিলেন সুনীল চৌধুরী। পার্টির সকলের জ্যাঠামশাই। দলীয় তহবিলের আয়ব্যায়ের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব যিনি রাখতেন তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সদর দপ্তরে তিনি খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতেন। কাটিয়ে দিতেন কাঁচা চাল চিবিয়ে। দিনগুলো তাঁর ছিল গতে বাঁধা। থাকতেন তিনি বেলেঘাটার সি আই টি বিল্ডিং-এ। রোজ সকালে সেখান থেকে হেঁটে চলে যেতেন সুকান্তনগরে ভাইপোর বাড়িতে। খাওয়াদাওয়া সেরে কিছুক্ষণ সেখানেই বিশ্রাম নিতেন। তারপর পার্টি অফিস থেকে গাড়ি এলে সেই গাড়িতেই তিনি চলে যেতেন দলের সদর দপ্তরে। সহকর্মী চন্ডী চক্রবর্তী ও পঙ্কজ ঘোষও বেশিরভাগ দিনই থাকতেন ওই গাড়িতে। তাঁর রাতের রুটিনও ছিল প্রায় একইরকম। পার্টি অফিস থেকে ভাইপোর

◆ ◆ ◆

পশ্চিমবঙ্গের এখন ভিড় ট্রেনে, জনবহুল স্টেশনে, বাসের ভিতর, অথবা যে কোন প্রকাশ্য স্থানে, দুবৃত্তরা মানুষকে খুন করে, কেউ কিছু দেখে না। জনবহুল রাস্তায় সকলের চোখের সামনে মহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই হয়ে যায়, সে ঘটনারও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায় না।

◆ ◆ ◆

বাড়িতে ফিরে রাতের খাওয়াদাওয়া সারার পর কিছুক্ষণের জন্য যেতেন সুকান্তনগরেই গোপাল দে নামে একজনের বাড়িতে। গোপাল দে ছিলেন ওঁর স্নেহভাজন। ভাইপোর বাড়িতে রাতের খাওয়া সেরে গোপালের বাড়ি যাওয়া ছিল তাঁর নিত্যদিনের রুটিন। কিন্তু ৯৬-র ১০ মে সেই রুটিনের হেরফের হয়েছিল কিনা, একবছর পরেও পুলিশ সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। বিধানসভা ও লোকসভার ভোটের দল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ওইদিন সারা রাজ্য ছিল সরগরম। ভোটের খবর শুনে পার্টি অফিস থেকে ভাইপোর বাড়িতে ফিরতে সেদিন তাঁর কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত সুকান্তনগরে গোপালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 'জ্যাঠামশাই' রাত সাড়ে ৯ টার মধ্যেই পৌঁছে যেতেন বেলেঘাটার সি আই টি মোড়ে। সেখানকার একটি দোকান থেকে সুপারি বা মৌরি নিয়ে তিনি কোয়ার্টারে ফিরতেন। পুলিশ পরে জানতে পারে সুপারি বা মৌরি নিতে সেইদিন আর তিনি সি আই টি মোড়ের ওই দোকানে যাননি। ১৩ মে সকালে কচুরিপানায় ভরা সুকান্তনগর খালে নিখোঁজ সুশীল চৌধুরীর খোঁজ পাওয়া যায়। তবে মরদেহ হিসেবে। বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। কিন্তু এই ঘটনাতেও খোঁজ মেলেনি প্রত্যক্ষদর্শীর। জেরা করেও পুলিশ খুব দুর এগোতে পারেনি। খালের পাশের ঢালু জমিতে পড়ে থাকা একটি লাইটার অবশ্য পুলিশকে বেশ ধাঁধায় ফেলে দেয়। লাইটারের গায়ে লেখা ছিল এস কে পি। এই এস কে পি-কে হন্যে হয়ে খোঁজেন গোয়েন্দারা। যথারীতি খোঁজ মেলেনি। নামটা পাওয়া যায়নি ভোটার তালিকাতেও। এহেন 'জ্যাঠামশাই'-এর হত্যাকাণ্ডের রহস্য একবছরেও ফাঁস করা যায়নি। পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খোদ রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে তদন্তের দায়িত্ব দিলেও খুনের কিনারা হয়নি। 'প্রতক্ষ দর্শীর' প্রশ্নে শুধু মুচকিই হেসেছেন দুঁদে পুলিশ কর্তারা।

দৃশ্য—৩

আবার চলন্ত লোকাল ট্রেন। চলতি বছরের ৬ জুন। সবে অশোকনগর স্টেশন ছেড়েছে বনগাঁ লোকাল। আতঙ্কে দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল এক শীর্ণকায় বৃদ্ধের। তখন তাঁকে ঘিরে ফেলেছে জনা পাঁচেক যুবক। তাদের হাতে ভোজালি আর রিভলবার। অফিসের ভিড়ঠাসা কামরার ভিতর থেকে তারা টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বৃদ্ধকে। যুবকদের জান্তব চোখমুখ দেখে ট্রেনের কোন যাত্রীই তাদের বাধা দিতে সাহস পায়নি। শিয়ালদার ব্যবসায়ী তাপস শর্মার রক্ত হঠাৎই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলেন বাধা দেবেন। পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র যুবকদের সংখ্যা দেখে। শুধু বলেছিলেন কি হচ্ছে? উত্তরে চিৎকার করে দুষ্কৃতিদের একজন বলেছিল, "এই লোকটা বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে। আমাদের জীবনও শেষ করে দিয়েছে। আমরা একে ছাড়ব না"। যুবকরা সেদিন ছাড়েনি অশোকনগরের সি পি এম নেতা ও পুরসভার কমিশনার কালীপদ সরকারকে। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ' থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করে তারা। মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য

একইভাবে ফের গুলি করা হয় তার তলপেটেও। তারপর? প্রচণ্ড ঘৃণায় লাথি মেরে তারা ট্রেন থেকে ফেলে দেয় মৃতদেহ। দিনদুপুরে লোকাল ট্রেনের কামরায় এই মাপের একজন জনপ্রতিনিধি খুনের ঘটনা বামফ্রন্টের বিশ বছরে তৈরি করে দেয় এক নতুন নজির।

আতঙ্ক

চোখের সামনে এইভাবে পরিচিত একজনকে খুন হতে দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবেননি তরুণ তাপস। ট্রেন থেকে নেমেই আতঙ্কে ছুটে আসেন বন্ধুদের কাছে। ভয়ে উত্তেজনায় গড়গড় করে উগলে ফেলেন সমস্ত ঘটনা। বন্ধুরা পরামর্শ দেন তক্ষুণি তক্ষুণি পুলিশ বা সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে। আতঙ্কিত তাপস চাননি প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী হতে। তাঁর একটাই কথা, একবার বিবেকের টানে সারা দিয়ে সারা জীবনের মত পস্তাতে হবে যে। ব্যবসা তো লাটে উঠবে। না খেতে পেয়ে মরার যোগাড় হবে। আতঙ্কিত তাপস পরক্ষণেই মুখ বন্ধ করেছেন। ওই ঘটনা সম্পর্কে কুলুপ তাঁর এখনও আঁটা।

কিন্তু কি এমন ঘটনা ঘটল যে খুন হতে হল কালীপদ সরকারকে? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কাছে আসতে শুরু করে নতুন নতুন তথ্য। যার সঙ্গে জড়িয়ে যায় রাজনৈতিক নেতা ও অপরাধীর ঘনিষ্ঠতা। সি পি এমের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের দলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধীদের ব্যবহার করার নানান সূত্র। এইসব কারণের জন্যই নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। কেননা, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'।

বাঘে ছুঁলে .....

বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ময়দানে হার ছিনতাই হয় লেকটাউনের মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছিনতাইবাজকে ধরতে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মধুমিতা। আশেপাশে ছিলেন বহু হাওয়া খেতে আসা মানুষ। তারা ঘটনাটি দেখেও কেউ দেখেননি। মাঝখান থেকে পা ভেঙেছে মধুমিতার। চম্পট দিয়েছে ছিনতাইবাজ। হারানো হার ফিরে পেতে থানা থেকে লালবাজার পায়ের শুকতলা খসে গেছে এই তরুণীর। এই সামান্য ঘটনাতেও সাক্ষী দিতে রাজি নয় কেউ। কোন সাক্ষী তথা বাদী হয়ে হাইকোর্টের অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে হয়রান হাওড়ার অশোক পাঁজা। সিমেন্ট কারখানার মেসিন তৈরির কারখানা তাঁর। একটি কোম্পানি মেসিন নিয়ে চুক্তিমত টাকা দেয়নি। এই নিয়ে চলছে মামলা। গত চারবছর ধরে। উকিলের পর উকিল পালটেছে। কিন্তু সাক্ষী হিসেবে হয়রানি বেড়েছে তাঁর। একপক্ষ আদালতে হাজির হলে অন্যপক্ষ আসে না। দু'পক্ষ এলে বিচারপতি আসেন না। এইভাবে তারিখের পর তারিখ পেছোয়। সাক্ষীর স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে। ফলে কাঠগোড়ায় দাঁড়ালে অন্য পক্ষের আইনজীবী জেরা করলে সাক্ষী স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে খেই হারিয়ে ফেলেন। উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অপরাধী সাজা পায় না।

◆ ◆ ◆

পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য খোদ রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে তদন্তের দায়িত্ব দিলেও খুনের কিনারা হয়নি। 'প্রতক্ষ দর্শীর' প্রশ্নে শুধু মুচকিই হেসেছেন দুঁদে পুলিশ কর্তারা।

◆ ◆ ◆

সাক্ষীর হয়রানি নিস্ফল হয়। তাই আর কেউ সাক্ষী হতে চায় না। প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে যেমন কিনারা হয় না বহু তদন্তের তেমনই সাক্ষীর অভাবে জমে মামলার পাহাড়। কিন্তু কেন পাওয়া যায় না প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী?

গোয়েন্দা ও পুলিশ

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান ডঃ নজরুল ইসলাম দু'টি কারণ ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমত হয়রানি, দ্বিতীয়ত ঝুঁকি। তাঁর মতে, কেউ যদি কোনও ঘটনা জানে, দেখে, বলে তাহলে পুলিশ তো বটেই, বিভিন্ন খবরের কাগজ, দূরদর্শনের প্রতিনিধিরা গিয়ে জেরায় জেরায় তাকে জেরবার করে তোলে। ফলে সে নাজেহাল হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী হলে পুলিশের লোক গিয়ে তাকে ডেকে এনে সাক্ষী বানায়। অনেকদিন পরে মামলা শুরু হয়। একদিন কোর্টে গেল, সাক্ষী হয়ে গেল তা তো নয়। তিনি বলেন, আমি নিজে সাক্ষী দিতে গিয়ে বুঝেছি। ঘটনার পর অনেকদিন চলে গেলে স্বাভাবিকভাবে লোকে ভুলে যায়। তার ওপর ডিফেন্সের উকিল যেভাবে জেরা করে তাতে আরও সব গুলিয়ে দেয়। তাই অনেকে প্রত্যক্ষদর্শী থাকলেও সাক্ষী দিতে আসে না. এই তো কিছুদিন আগে মিনিবাসে একজনের ঘড়ি ছিনতাই হল। ভিড়ঠাসা মিনিবাস তবু প্রত্যক্ষদর্শী মিলল না। যাঁর ঘড়ি ছিনতাই হল সে শ্বশুরমশাইকে নিয়ে এসে বলল, ঘড়ি চাই না, সাক্ষী দিতে পারব না। এই ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব প্রায় প্রতিটি কেসেই হয় বলে ডঃ ইসলামের অভিমত। তিনি বলেন, এরপর থাকে 'ঝুঁকি'। যারা ডাকাতি বা খুন করে সেইসব লোক দুধর্ষ প্রকৃতির হয়। তাই যে সাক্ষী দেব বলে মনস্থ করে সে জানে সাক্ষী দেবার পর কি অবস্থা হবে। আমাদের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা এমন যাতে অপরাধীর সাজা হবার সম্ভাবনা অনেক অনেকগুণ বেশি। যদিও চূড়ান্ত বিচারে কি হবে তা বলা যায় না। তার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। প্রাথমিকভাবে সকলে জানতে চায় কি হবে, 'বেল' অথবা 'জেল'। আসামীর যে প্রথমেই জেল হবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। আসামীকে বেল দিয়ে দেওয়া হলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিরুদ্ধে তো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। দ্বিতীয়ত বিচার হতে প্রচুর দেরি হয়। তার ফলে প্রমাণের অভাবে সামান্য কারণে আসামী ছাড়া পেয়ে যায়। বিপদ বাড়ে সাক্ষীর। তাই এখন সাধারণ মানুষের প্রবণতা হচ্ছে কোনও ঘটনা দেখলেও না বলা।

রাজ্য পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (অর্গানাইজেশন) রজত মজুমদার অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া না পাওয়ার বিষয়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, ইচ্ছে করলে পুলিশ সাক্ষী যোগাড় করতে পারে। তার একটা 'কায়দা' আছে। চোখের সামনে অপরাধ সংগঠিত হলে লোকে তো ভয় পাবেই। দীর্ঘদিন রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সি আই ডি-র ডি আই জি থাকার সুবাদে রজতবাবু বলেন, কোনও ঘটনা ঘটলে খোঁজ করতাম কেউ আহত হল কি না? হলে, তাকে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কে নিয়ে গেল? তাকে খুঁজে বের করতে পারলে কিছু সূত্র পাওয়া যেতই। এখন ট্রেনে কোনও ঘটনা ঘটলে ঐ ট্রেনের ঐ কামরায় সাদা পোষাকে গোয়েন্দারা উঠে পড়েন। পরপর কয়েকদিন দেখে 'কমন' লোককে খুঁজে বের করেন। তারপর তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে সাক্ষী পাওয়া

যায় বলেই রজতবাবুর অভিমত। তাঁর মতে, কোন ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায়নি, এমন ঘটনা কখনও হয়নি। তিনি বলেন ১৯৮০ থেকে '৯২ সাল পর্যন্ত রাজ্যে পর পর বেশ কয়েকটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই সাক্ষী পেয়েছি। শতকরা একশ ভাগ কেসের সমাধান হয়েছে। আমরা তো ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাস্থল দেখেই বুঝতে পারতাম তা নতুন গ্যাঙ না পুরনো গ্যাঙ করেছে। পুরনো গ্যাঙ করলে তো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত।

লোকে মনে করে পুলিশকে জেরা করতে সুযোগ দিলে দেরি হবে। সময় নষ্ট হবে। বাড়িতে বলবে, কেন ঝামেলায় পড়লে? যারা, সত্যিকারের খুনি তারা দেখলে হুমকি দেবে। বাস্তবটা হল, কোনও সাক্ষীকেই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ, প্রতারণা বা জালিয়াতির মামলায় দেখা গেছে, লোকে নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসে। বর্তমান দেশে রাজনৈতিক প্রশ্রয় বা আশ্রয়ে ক্রিমিনালদের বাড়বাড়ন্ত। অপরাধীরা যে কোনও জায়গায় একটা দিক নিয়ে নেয়। সেই কারণে সাধারণ লোক কেন সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে? বোমার শব্দ শুনলেও বলবে দেখেনি। অনেকদূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সাক্ষী—খরচ

সাক্ষী দেবার জন্য সরকারিভাবেই পয়সা পাওয়া যায়। দেওয়ানি মামলায় সাক্ষীর যাতায়াত ও রাহা খরচ দেন যিনি মামলা করেছেন তিনি। সরকারি মামলায় যার যেমন পেশা, যেমন মামলা সেই অনুযায়ী সাক্ষীর রাহাখরচ বরাদ্দ করেন ম্যাজিস্ট্রেট। যে জায়গা থেকে সাক্ষী আসেন তার দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া দেওয়া হয়। বেশি দূরের হলে থাকা ও খাওয়া খরচ দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা সাক্ষীর হয়রানি বা ঝুঁকির তুলনায় এতই কম যে কেউ আর সাক্ষী দিতে চায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দুঁদে গোয়েন্দা বলেন, সরকারি সাক্ষী হলে তো আবার সাক্ষীর রাহাখরচ বের করতে ঘুষ দিতে হয়। ধরা যাক, কলকাতার মধ্যে সাক্ষী দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করে দিলেন সাক্ষীর বাসভাড়া যাতায়াতে দু'টাকা দু'টাকা—চার টাকা। এই চার টাকাটুকু পেতে সাক্ষীর ঘুষ দিতে ৫০ টাকা চলে গেল। ফলে কে আর সাক্ষী দিতে আগ্রহী হবে।

আইনের চোখে

বিভিন্ন লোমহর্ষক ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হবার কারণ হিসেবে ফৌজদারি আইনজীবী সৌরীণ তালুকদার মনে করেন পুলিশ ক্রমশ সাধারণ মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। পুলিশ দিতে পারে না নিরাপত্তা। নকশাল আমলে কোর্টে দাঁড়িয়ে তারা বলতেন সাক্ষী নেই। এখনও প্রশাসন প্রত্যক্ষদর্শীকে নিরাপত্তা দিতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা, এখন পুলিশের চেয়ে গুণ্ডাদের ক্ষমতা অনেক বেশি। সাক্ষীকে সেই গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য শুনানির সময় বারবার আদালতে যেতে হয়। তাকে জেরা করা হয়। এটা হবেই। ডিফেন্সের উকিল সাক্ষীকে ঘটনার খেই হারিয়ে দেবার চেষ্টা করবেই। এটা পৃথিবীর সর্বত্রই হয়। আর পুলিশ-

◆ ◆ ◆

বর্তমান দেশে রাজনৈতিক প্রশ্রয় বা আশ্রয়ে ক্রিমিনালদের বাড়বাড়ন্ত। অপরাধীরা যে কোনও জায়গায় একটা দিক নিয়ে নেয়। সেই কারণে সাধারণ লোক কেন সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবে?

◆ ◆ ◆

প্রশাসনের বিরুদ্ধে তো কেউই এখন সাক্ষী দিতে চায় না। পুলিশের ওপর মানুষের আর বিশ্বাস নেই। পুলিশ 'ফলস' কেস তৈরি করছে। তার ওপর মামলা চলছে। সাজাও হচ্ছে। তদন্ত অনেকটাই যথাযথ হয় না। পুলিশ কাউকে ধরার আগে পনেরো বার চিন্তা করে কি? অভিযোগ পেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার। কেউ হয়ত চুরি করেনি। শুধুমাত্র মিথ্যে অভিযোগের কারণে গ্রেপ্তার হল। সঙ্গে সঙ্গে চোর অপবাদ জুটে গেল। ফলস কেসে ফলস গ্রেপ্তার। ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা বেশি। পুলিশ নিরপেক্ষ থাকলে এটা হত না। সেই কারণেই সৌরিণবাবুর মতে পুরো আইন-বিচার ব্যবস্থাটাই ভুলে ভরা। তাই মানুষ সাক্ষী দিতে গিয়ে নিজের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে কেন? আইনজীবীরা বলেন, সাক্ষীকে বাঁচাবে কে? দেশে আইনশৃঙ্খলা নেই। পুলিশের কাছে সাক্ষী দিতে গিয়ে কেউ কি রাতে ফিরে এসে ভালভাবে ঘুমোতে পারবে? এখন তো সাক্ষীও খুন হচ্ছে। তাকে হুমকি দেওয়া হয়। মারধর না করলেও সাক্ষীর বাড়িতে হামলা হয়। সবাইকে তো আর পুলিশ প্রহরা দেওয়া সম্ভব নয়। এব্যাপারে পুলিশ অফিসাররা একমত, সব সাক্ষীকে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যে প্রচুর আদালত, প্রচুর মামলার পাহাড়। এইসব মামলার সাক্ষীদের নিরাপত্তা দিতে গেলে রাজ্যের পুরো পুলিশ বাহিনীতেও কুলোবে না।

এভিডেন্স এ্যাক্ট

এভিডেন্স এ্যাক্ট বা প্রমাণসাপেক্ষে আইন। এই আইনে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী থাকতে হবে। যেখানে প্রত্যক্ষদর্শী নেই সেখানে ঘটনাবলীকে মালার মত গেঁথে হাজির করতে হবে বিচারকের সামনে। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি আদালতে কোনওভাবেই গ্রাহ্য হয় না। পুলিশ আসামীকে জানলেও সবসময় প্রত্যক্ষদর্শী হাজির করে সাক্ষী দেওয়াতে পারে না। কতগুলো বিষয় অবশ্য আদালত সত্য বলে ধরে নেয়। সেগুলো আইনত অনুমানসিদ্ধ। সব প্রমাণপত্রই আদালতের কাছে গ্রাহ্য হয় না। তাই সার্টিফাই কপিই শুধুমাত্র এভিডেন্স হিসেবে আসে। এতগুলো প্রমাণ আদালতে হাজির করতে পারলে, গৃহীত হলে, মামলায় জিত হয়।

পরিশেষে

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৫ সালে জেলাগুলোতে ৩৮৬টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৯৬ সালে সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৫০১। এর মধ্যে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের ঘটনাও ধরা হয়েছে। জেলাগুলিতে খুনের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে ১ হাজার ৭০৫ জন খুন হন। '৯৬ সালে সংখ্যাটা বেড়ে ১ হাজার ৮২৮। কোনও রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে কত লোকের মৃত্যু হয়েছে, সেই হিসেব রাজ্য বা কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের কোনও শাখাতেই নেই। গোয়েন্দা পুলিশের অফিসারদের মতে, 'শেষ বছরে বা.চলতি বছরে গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল, সি পি এমের রাজ্য কমিটির হিসেবরক্ষক সুশীল চৌধুরির খুনীদের চিহ্নিত করতে না পারা। গোয়েন্দাদের এই ব্যর্থতার জন্য বিধানসভার গত বাজেট অধিবেশনে পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেন ধরা যায়নি জ্যাঠামশাইয়ের খুনীকে?' গোয়েন্দাদের ব্যাখ্যাঃ "এই ঘটনা রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাই দেখা দিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর

শেষাংশ ছাব্বিশ পাতায়



ইয়ে বিহার হ্যায়

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও, বিহারই ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছে এক নিরক্ষর মুখ্যমন্ত্রী। এমন কি 'ভ্যাঁয়সার' বাহন হিসেবে সেখানে ব্যবহার করা হয় 'স্কুটার'। সব অসম্ভব যেখানে সম্ভব তার নামই হল বিহার। সম্প্রতি বিহার ঘুরে এসে সেখানকার হাল হকিকৎ সম্পর্কে লিখেছেন

— প্রসেনজিৎ সিংহ

কিছুদিন আগে পাটনার ডাকবাংলো চৌমাথায় এক বিজ্ঞাপন কোম্পানি একটি বড় হোর্ডিংয়ে কার্টুন আঁকিয়েছিল। বিষয়বস্তু ছিল অনেকটা এইরকম : প্রচুর ভাঙাচোরা গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির জলে পথচারী নাকাল। ম্যাটাডোরে রোগী চলেছে হাসপাতালে, খোলা ম্যানহোলে বাচ্চা পড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। তলায় শুধু একটাই বাক্য : হাম পাটনাওয়ালে ফির ভি মুসকুরাতে হ্যায়। বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এসে এই ডাকবাংলো-চৌমাথায়

কার্টুনটকেই লালু পরবর্তী বিহারের আসল ছবি বলে মনে হবে যে কোনও লোকেরই। তবে এতদিন সাধু যাদবের কল্যাণে যেখানে লালুর ছবি শোভা পেত সেখানে এই দুঃসাহসী কার্টুন অনেক পাটনাবাসীই দিবাস্বপ্ন মনে করে চোখ কচলে দ্বিতীয়বার দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, বিরোধী দলগুলো সহ রাজ্যের সাধারণ মানুষ দেখেছিলেন, কেমন করে উপেন বিশ্বাসের বেড়ি না পরে লালু অবলীলায় পাকদণ্ডীর শর্টকাটে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অনেকেরই চোখ তখন মাথায় উঠেছিল। তার চেয়েও অবাক হয়েছিলেন সবাই লালুর হাইভোল্টেজ ড্রামায়। যখন রাতারাতি রাবড়িকে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতার উমেদারদের বেলুনগুলোকে তিনি চুপসে দিলেন।

এর পরেও পাটনাবাসী হাসছেন। জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে একটা কথাই বলেছেন, 'ইয়ে বিহার হ্যায়। ইধার সবকুছ মুমকিন হ্যায়'।

কথাটা বুঝিয়ে বলেছিলেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক। চরম বৈপরীত্যই যে বিহারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খনিজসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বিহারের গলায় মাদুলি হয়ে ঝুলে থাকে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এই রাজ্যই দেশকে দিতে পারে একজন নিরক্ষর মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এই রাজ্যই 'ভ্যাঁয়সা'র বাহন হিসেবে স্কুটার ব্যবহার করা হয়েছে এমন চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে পশুপালন 'ঘোটলা' সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। যদিও পাটনা স্টেশনের বিরজু যাদবের মত রিক্সাচালকরা মনে করে লালুই ওদের 'মাইবাপ' এবং ওদের জন্য অনেক কিছু করেছেন বলেই "উঁচে বর্গকে লোগোঁ নে উনকো ঘোটালা মে ফাঁসায়া"। বস্তুত বিহারের গ্রামে গ্রামে এমনই একটা জনরব সযত্নে ছড়িয়ে দেবার কাজটা করে চলেছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের ছোট, বড়, মাঝারি মাপের নেতারা। দলীয় অফিসে চন্দ্রেশ্বর সিং গৌতম নামে এক নেতার কথায় তারই আভাস পাওয়া গেল। তার মতে, লালুকে ফাঁসানোর মুলে উচ্চ বর্ণের আমলারাই দায়ী। লালু ভালমানুষ। দলিতদের জন্য ভেবে-ভেবেই তার দিন কাটে। সেটা অনেকে উপলব্ধিও করেছেন। তাই লালুর সমর্থনে পাটনা স্টেশনের সমস্ত রিক্সাচালক রিক্সা-মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দলের সূক্ষ্ম প্যাঁচপয়জারের চেয়ে জাতপাতের হিসেবই যে তাদের কাছে বড় ফ্যাক্টর এবং যে কোনও সমস্যাকে তারা যে ওই আলোতেই দেখতে অভ্যস্ত তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন পাটনাসহ বিহারের তথাকথিত 'পিছড়ে বর্গ' এর লোকেরা। বিহারে এই শ্রেণী দীর্ঘদিন বিহারকে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া, নিরক্ষরের বিহার হিসেবেই দেখে এসেছে, ভেবে এসেছে। তাদের কাছে রাজ্যের উন্নতি অবনতির গল্প নেহাতই নীরস। কিন্তু ঠাকুরদের শোষণ কিংবা সংখ্যালঘুদের বেচাল পদক্ষেপ অনেক বেশি তাতপর্যপূর্ণ।

লালুর ছাত্র আন্দোলন করা ইমেজ জয়প্রকাশ নারায়ণের সময় থেকেই তাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বিহারে দীর্ঘদিন ধরে কায়েম হওয়া সামন্ততন্ত্রকে পিছু হঠানোর ক্ষমতা লালুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করে বিহারের শোষিত দলিত সম্প্রদায়। সেই প্রথম তাদের সম্প্রদায়ের কেউ এভাবে বিপুল বিক্রমে ক্ষমতায় উঠে এসেছিল। সেখানে জাতের ফিলিংসেটাও বগলদাবা করেছিলেন লালু যাদব। তবে শুধুমাত্র জাতপাতকে পুঁজি করে রাজ্যপাট ধরে রাখা ততটা সহজ ছিল না। কারণ বিহারে অনেক জায়গাতেই পাশাপাশি হিন্দুমুসলিম অবস্থান জাতিদাঙ্গার সূতিকাঘর। কিন্তু লালুর বড় কৃতিত্ব, তিনি তার দেহাতিসুলভ ক্যারিস্মা দিয়েই অবলীলায় রুখে দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিস্ফোরণ। পাশাপাশি ছিল, গ্রামে গ্রামে দলিত শিশুদের সাবান মাখিয়ে চুল নখ কাটিয়ে একেবারে দলিত বিহারের অন্দর মহলে ঢুকে যাওয়ার মত জনমোহিনী কার্যকলাপ। পিছড়ে বর্গ তখন সত্যিই ভাবতেন 'হামারা লালু অব তখত পর। অব হামরা রাজ চলে গা বিহার মে,' চলেছিল বহুদিনই। এখনও চলছে। শুধু বিহারের হৃদয়ের লালু হার্টে আনস্টেবল অ্যানজাইনা নিয়ে হাসপাতালে। কিন্তু আজও, লালুর অতি বড় বিদ্বেষীও মুখ ফুটে বলেন নি যে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। বরং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, সিংহাসন এখন লালুর বাসভবনের আমতলা থেকে বন্দিশালা বা আরও পরে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। বিহার শাসনের অদৃশ্য সুতো তার হাতেই ধরা।

◆ ◆ ◆

খনিজসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বিহারের গলায় মাদুলি হয়ে ঝুলে থাকে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এই রাজ্যই দেশকে দিতে পারে একজন নিরক্ষর মুখ্যমন্ত্রী।

◆ ◆ ◆

অবশ্য রাবড়ি দেবী গদিয়সী হয়েই ঘোষণা করেছেন "ম্যায় কাঠপুতলি নেহি হুঁ।" শুধু তাই নয় তা টিপিক্যাল দেহাতি মহিলার ঢঙেই বিরোধীদের সামলাচ্ছেন। বিধানসভায় বিরোধী বিধায়ক সুশীল মোদি, রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই দাবী তুলেছিলেন, রাবড়ি দেবী প্রথমে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তার পরে কারও স্ত্রী কারও মা কারও দিদি। তাই তার বাড়িতে একজন কেলেংকারির নায়ক আশ্রয় পেতে পারে না। উত্তরে রাবড়ি দেবী বলেন, "ম্যায় আপকো বড়ে ভাই মানতি হুঁ, কিঁউ না সাহাবকো (লালু) আপহি কে ঘর ভেজা যায়ে।" উপস্থিত বিধায়করা সেদিনই বুঝেছিলেন 'রসোইখানায়' 'ব্যয়গন কা ভর্তা' বানানো রাবড়িকে যতটা সরল ভাবা গিয়েছিল আদতে ততটা নন।

রাজ্যপাট চালাতে পারবেন কিনা এ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে অল্পবয়েসী এক বিধায়ক সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি মোক্ষম জবাব ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তার দিকে।" বাবুয়া তোহরা কি জনম সে ইতনা লম্বাই হ্যায়" (তুমি কি জন্মেই এতটা লম্বা হয়ে গিয়েছ) অর্থাৎ রোসো। আমিও অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে বেশি সময় নেব না।

ইতিমধ্যেই তার কিছু ইঙ্গিতও মিলেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সচিবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রাবড়ি দেবী প্রায় নিয়ম করেই সচিবালয়ে আসেন। ক্যাবিনেটের বৈঠকে বসেন। তবে হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে এখনও দড় হয়ে উঠতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই বিধায়কদের প্রশ্ন শুনে ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী বা অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি মহাবীর প্রসাদের দিকে তাকান। মহাবীর প্রসাদ তাকে দ্রুত ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য করে তোলার চেষ্টায় আছেন। এ কাজে তিনি কিছুটা সফলও। পাটনার এক অভিজ্ঞ

সাংবাদিক জানালেন, গত ৯ আগস্ট ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সভায় যখন রাবড়িদেবী দশ লাইনের যুক্তাক্ষর বর্জিত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তার কণ্ঠস্বরকেও ছাপিয়ে যাচ্ছিল প্রম্পটার মহাবীর প্রসাদের কণ্ঠ। সে নিয়ে বিস্তর কটাক্ষেরও সম্মুখীন হয়েছেন রাবড়ি। অনেক স্যাডো প্র্যাকটিসের পর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রাবড়িকে নাকি কিছুটা স্বচ্ছন্দ বলে মনে হয়েছে।

রাবড়ির আমলে সরকারি কাজকর্মে কিছুটা গতি এসেছে বলে মনে করেন ওই আমলা। লালু যাদবের আমলে বাড়ির লাগোয়া আমতলায় লালু সাংবাদিক-আমজনতা নিয়ে দিনভর দরবার চলত। লালুর একটা 'ফাইল অ্যালার্জি' ছিল। কিছুতেই সই করতে চাইতেন না। আমলাদের দেখলেই বিরক্ত হতেন। মাঝে মধ্যে দু চারটে দস্তখত করে বলতেন "আব বিহার সরকার চলে আরাম করেন"। তার নিজের দলের মন্ত্রী, বিধায়করাই তার দেখা পেতেন না। তবে লালু প্রচারের স্পটলাইটগুলোকে নিজের পায়ের তলায় বসিয়ে রাখার ব্যাপারে একশভাগই সফল ছিলেন বলা যায়। অবারিত দ্বার ছিল সাংবাদিকদের জন্য। অচিরেই লালুর ভাগ্যে মিডিয়া-ডার্লিং শিরোপা জোটে। রাবড়ি লালুর ধরমপত্নী হবার 'সুবাদে সাহাবকা অধুরা কাজ পুরি' করতে চান। কিন্তু হেঁসেলের হ্যাংওভার কাটতে এখনও তার বেশ কিছুদিন লেগে যাবে। তবে প্রতিদিন অনেক ফাইলেই তার দস্তখত পড়ছে। জাম্বো ক্যাবিনেটের গড়ে দশজন অন্তত তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন।

সুশীল মোদি সব শুনে বললেন, কেয়া আপ জানতে হ্যায় এক সাইন করনে মে উনকি কিতনা টাইম লাগ যাতা ? পুরে ফর্টিফাইভ সেকেন্ড। ঔর আপ ক্যায়া শোচতে হ্যায় ফাইল ক্লিয়ার করনে কা আক্কল সচমুচ উনমে হ্যায় ?" (আপনি কি জানেন একটা সই করতে কত সময় লাগে? পুরো পয়তাল্লিশ সেকেন্ড। আর আপনি কি মনে করেন ফাইল ক্লিয়ার করার বুদ্ধি সত্যি সত্যিই ওর মধ্যে আছে?) ওর মতে পুরো প্রশাসন এখন রাবড়িদেবীকে ট্রেনিং দিচ্ছে। "ওহ ভি দো দিন মে লালুকা পথ আপনায়ে গা"। এই ডামি সরকারে রাবড়ি হচ্ছে লালুর ছায়ামাত্র। প্রশাসন বলে লালুর আমলেও কিছু ছিল না, এখনও নেই।

সুশীল মোদির কথা বাদ দিয়ে গত কয়েক মাসে প্রশাসনের অবস্থার দিকে তাকালে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিহারে সরকারের চেয়ে আদালতের নির্দেশেই বেশি কাজ হচ্ছে। এমন হওয়া সম্ভব তখনই যখন, প্রশাসন কার্যত নিষ্কর্মা,

◆ ◆ ◆

সুশীল মোদি সব শুনে বললেন, কেয়া আপ জানতে হ্যায় এক সাইন করনে মে উনকি কিতনা টাইম লাগ যাতা ? পুরে ফর্টিফাইভ সেকেন্ড। ঔর আপ ক্যায়া শোচতে হ্যায় ফাইল ক্লিয়ার করনে কা আক্কল সচমুচ উনমে হ্যায় ?"

◆ ◆ ◆

ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে লালুকে গ্রেফতার করতে সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়ায় সি বি আইয়ের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা উপেন বিশ্বাস সমালোচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি জনস্বার্থ মামলায় পাটনা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন একটি জায়গার জমা জল যদি ১০ দিনের মধ্যে সরকার না সরাতে পারে, তবে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ওই কাজ করাতে হবে। এই রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ঘন-ঘনই আদালত অবমাননার দায়ে জবাবদিহি করে হাজিরা দিতে হচ্ছে।

মগের মুল্লুকের অস্তিত্ব আজ আর

◆ ◆ ◆

সরকারি টাকার নয়ছয়-এর কথাও রিপোর্টে দেখানো হয়েছে। পাটনা সচিবালয় তহবিল থেকে মন্ত্রীদের জন্যই তোলা হয়েছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা যেখানে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

◆ ◆ ◆

নেই। কিন্তু বিহার তো আছে। বিহারের বিস্তীর্ণ খনি অঞ্চলে রাজ্য প্রশাসন দাঁত ফোটাতে পারে না। সেখানকার প্যারালাল শাসন ব্যবস্থা চালায় মাফিয়ারা। খনি অঞ্চলের অর্থনীতি হিসেব বহির্ভূত অর্থ ও মাসল পাওয়ারের দুর্দম নির্দেশে পরিচালিত হয়। বিচার কিংবা বিচার-বিচার খেলা সেখানে অবান্তর। মাফিয়া ডনের অঙ্গুলি হেলনই মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে খুব সহজে। রাবড়ির মন্ত্রিসভায় এখন ডনরাও রয়েছেন। যেমন আব্বুদেবী। ধানবাদ কয়লা খনি এলাকায় দ্রুত উঠে আসা মহিলা ডন হিসেবে রীতিমত বিভীষিকা বলে পরিচিত। রাবড়ির জাম্বো মন্ত্রিসভায় এমন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর নাম করা যায় যাঁরা কুখ্যাত হিসেবেই পরিচিত। ভোজপুরের বিধায়ক রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিংয়ের কথাই ধরা যাক। তিন বছর আগে তিনি এক সার্কেল অফিসারের স্ত্রীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হন। শ্রীনারায়ণ যাদবের নামেও যৌন কেলেঙ্কারির কথা শোনা যায়। এবারে মন্ত্রিসভার কিছু মন্ত্রী তাদের নিজের এলাকাতেই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন যেমন গজেন্দ্র প্রসাদ রাই। বস্তুত ইনি একজন ঠিকাদার। আছেন রাম বিচার রাই তার নিজের এলাকাতেই দুজনকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে হত্যা করেন বলে শোনা যায়।

এইভাবে মন্ত্রীরাই সন্ত্রাসের নায়ক হয়ে উঠলে বা সন্ত্রাসবাদীরা মন্ত্রী হয়ে উঠলে বিহারের খুন-জখম, রাহাজানি, ডাকাতি রুখবে কে ?

আদালতের রায়ে জনসাধারণ খুশি। বিহারের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, আইনশৃঙ্খলা সবকিছুতেই যে চরম অবহেলার সাক্ষ্য বহন করছে বিহারের ওপর সাম্প্রতিক ক্যাগ (সি এ জি) রিপোর্টটি। গতবছরে বিহারের প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৮২৫ কোটি টাকা। এই সরকার মোট ৬২১ কোটি টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলেও লাভের মুখ দেখেনি কেউই। সরকারি টাকার নয়ছয়-এর কথাও রিপোর্টে দেখানো হয়েছে। পাটনা সচিবালয় তহবিল থেকে মন্ত্রীদের জন্যই তোলা হয়েছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা যেখানে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

ভামুয়া রোড স্টেশনে আলাপ হয়েছিল সরকারি-কর্মচারী যমুনা প্রসাদ সিংহের সঙ্গে। প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার মতে বিহারের একটা সরকারি বিভাগের নাম করুন, যেখানে সবচেয়ে কম দুর্নীতি এবং টাকাপয়সার কম নয়ছয় হয়েছে। উত্তরে তিনি জলসম্পদ ও জলপথ দফতরের কথা বলেন। এই দফতরেরই একমাসের কার্যকলাপ দেখা যাক। '৯১ ফেব্রুয়ারিতে বিহার শরীফের জলপথ

বিভাগ একমাসে ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা খরচ দেখিয়েছে নদীর পাঁড় উঁচু করার জন্য। কিন্তু আদৌ এই কাজ থেকে কোনও ফায়দা পাননি সাধারণ মানুষ। কারণ কাজটাই শেষ করা হয়নি। এবং তা হয়েছে খোদ ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চীফের নির্দেশেই।

বিহারের রাস্তাঘাটের হালত আরও খারাপ। খোদপাটনার অনেক বড় বড় রাস্তাতেই জলজমে থাকে। পূর্তদফতর বেবকে। ক্যাগ রিপোর্ট মোতাবেক এই রাজ্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার পর রাস্তার দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চিও বাড়েনি। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্য। কারণ রাজ্য এ ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশ সত্ত্বেও কোনও প্রস্তাবই পাঠায়নি। তাছাড়া নয়ছয়ের অভিযোগও প্রচুর। রোড ইঞ্জিনিয়ারিং আর্গানাইজেশন ডিভিশনের তিন অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার কাজকে ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার কাজ দেখিয়ে প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এদিক-ওদিক করে ফেলেছেন। এটা একটা প্রকল্পের উদাহরণমাত্র। খুঁজলে এমন আরও মিলবে তাতে সন্দেহ নেই। খুন্তি ডিভিশনের এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারই একটা বিশেষ প্রকল্পে প্রায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নয়ছয় করেছেন। সরকারের এমন প্রকল্প বছরে একটা দুটো পেলেই বড় ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারেন এইসব কর্মীরা।

বিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন এর যুগ্ম সচিব সনৎকুমার দত্ত বিহারের শিল্পের ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থার কথা জানালেন। উদার অর্থনীতির ঘোষণায় লালু প্রসাদ ও একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন নতুন শিল্পস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। গত সাত বছরে তিনি একেবারে চেষ্টা করেননি বললে ভুল হবে। চেষ্টা করেছিলেন। বিহারে নয়নয় করে হাজারের ও বেশি প্রকল্প এসেছিল অনাবাসী ভারতীয়দের থেকে। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তার রাজনৈতিক ইচ্ছা এ ব্যাপারে কাজ করলে আমলাতান্ত্রিক চরম অব্যবস্থায় প্রায় সবই ভেস্তে গেছে। এখনও পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েও অনাবাসীদের ৭টি প্রকল্প টিকে আছে তবে ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

বিহার কংগ্রেসের সভাপতি সরফরাজ আহমেদ শিল্পোন্নয়নে পরিকাঠামোগত অসম্পূর্ণতাকেইদায়ী করেন। পাশাপাশি বিহারের প্রচুর খনিজ সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। লালু প্রসাদ অবশ্য বিহারে শিল্পস্থাপনের জন্য টাটার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ওরা যদি পারে অন্যরা পারবেনা কেন ? কংগ্রেসের এক মাঝারি মাপের নেতা তিলেশ্বর রাও জানালেন, শিল্পের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই আর্থিক ব্যাপারে লালুর অসাফল্যের কারণ সরকারি প্রথা, কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব।

প্রশ্নটা সেখানেই। যে লালু অভিজ্ঞতার অভাবে আর্থিক ব্যাপারে অসফল হলেন, তাঁর নিরক্ষর পত্নী কি করে সেই বিহারের 'শুধার' আনবেন ?

রাবড়ি দেবী তার মহিলা ইমেজ ও লালুর প্রতি জনগণের 'সিমপ্যাথি ওয়েভ'কে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে ক্ষমতা টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন। কতখানি সফল হবেন বলা দুষ্কর।



মুখ্যমন্ত্রী আবাসের চৌহদ্দিতে বিচারে আশায় এসেছেন ভাগলপুরের শাস্ত্রীনগর থানার এক মহিলা গুলনার।

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী আবাসের চৌহদ্দিতে বিচারে আশায় এসেছিলেন ভাগলপুরের শাস্ত্রীনগর থানার এক মহিলা। গুলনার। পতি কামারউদ্দিন তার ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অকথ্য অত্যাচার চালায়। তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে। বর্তমানে অন্য একটি মহিলাকে নিয়ে কামারুদ্দিন সুখেই আছে। অথচ এ মহিলা থানায় নালিশ জানাতে গেলে তাকে একরকম দুর দুর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই অভিযোগ নিয়ে তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী আবাসে আসেন তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদকও সেখানে উপস্থিত। আলোকচিত্রীও ধরে রাখেন তার বিবরণের মুহূর্তটিকে। মুখ্যমন্ত্রী আবাসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অল্পবয়েসী এক অফিসার পরে জানালেন, এখন সারা বিহার জুড়েই এমন কান্ড চলছে এবং তা বোঝার জন্য মুখ্যমন্ত্রি আবাসের বাইরে যেতে হয় না। অথচ এই মন্ত্রীসভায় অন্তত এক ডজন লোক স্থান পেয়েছেন যারা ডাকসাইটে মাফিয়া বলে পরিচিত। ক্ষমতার সমীকরণে ব্যালান্স রাখতে গিয়েই যদি এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে তবে বিহার-বিহারই থাকবে। অনগ্রসর ইমেজের গুটি থেকে পূর্ণাঙ্গ বিহার মুক্তি পাবেনা কোনও দিনই।

স্টেশনে সাপ ঃ এ এক আতঙ্ক!

রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানের কলমের খোঁচায় গত ৩০ জুলাই নিউদিল্লি স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে বুকিং হেডক্লার্কও সাসপেন্ড হলেন। চাকরি খোয়া যাওয়ার কারণটি হল স্টেশন অপরিচ্ছন্নতা। মন্ত্রীর আচমকা পরিদর্শনের পরিণতিটা বাস্তবিক করুণ হলেও দৃষ্টান্তমূলক।

নিউ দিল্লি স্টেশনের এই হাল হলে, শিয়ালদহ ও হাওড়া শাখা ও সেই সঙ্গে শহরতলীর স্টেশনগুলোর হাল-হকিকৎ দেখলেতো মন্ত্রী মশাইয়ের কলমের খোঁচায় সবায়ের চাকরি খোয়াতে হবে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শিয়ালদহ-হাওড়া সহ শহরতলীর স্টেশনগুলোর দৈন্যদশা, অপরিষ্কার ও নোংরা পরিবেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ নিত্যযাত্রীদের কথা ভেবেই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন—প্রবীর চক্রবর্তী

'সাপের উৎপাত, ট্রেন অবরোধ'। কলকাতার মানুষের কাছে হাসির খোরাক হলেও, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রায় সব স্টেশনেই নিত্যযাত্রীদের একটা আতঙ্ক। আতঙ্ক যে শুধু সাপ তা নয়, বিছে, ধেড়ে ইঁদুর সবই রয়েছে এই তালিকায়। ট্রেন কামরাতেতো আরশোলা, ছারপোকা, মশা, মাছি এরা নিত্যযাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। সম্প্রতি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সুভাষগ্রাম স্টেশনে এক নম্বর প্লাটফর্মের পাশে একটা জঙ্গলের মধ্যে থেকে বিষাক্ত সাপের তাড়া, গত মাসের প্রথম দিকেই, কলকাতার প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। স্টেশনে সাপের উপদ্রবের প্রতিবাদে ঘন্টা দুয়েকের ট্রেন অবরোধও নাকি হয়েছিল। স্টেশনগুলোর পাশে ঝোপ, জঙ্গলে এধরনের বহু বিষাক্ত সাপ রয়েছে। একেতো স্টেশন চত্বরে চোর, ডাকাত, ছিনতাই বাজেদের দল রয়েছেই, তার ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়াটি হল 'সাপ'। ট্রেন যাত্রীরা ট্রেন ধরার জন্য দাঁড়িয়ে এমন সময় সাপ বেরুল ঝোপ থেকে। দিনের বেলায় যদি এরকম ঘটনা ঘটে তবে রাতের অবস্থাটা কতটা করুণ হয় ভাবুনতো! এরপর পশ্চিমবঙ্গের বাড়তি পাওনাটা হল লোডসেডিং। অন্ধকারে, ঘুটঘুটে পরিবেশে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামলেই আস্তিক আস্তিক গরুঢ় গরুঢ় বলে নামা ছাড়া কোন উপায়ই থাকে না নিত্যযাত্রীদের।

গত জুলাই মাসে একদিনতো শিয়ালদহগামী একটা লোকাল ট্রেনে সাপ তো একেবারে বহাল তবিয়তে যাত্রী সেজেই ট্রেন কামরায় উঠেছিল। অবশ্য সাপটা ছিল ঢোড়া। বাদায় জল জমেছে- সাপেরা এখন থাকবে কোথায়? সেজন্যই তো রয়েছে রেল। মা মনসার বাহনদের আতঙ্কে শিয়ালদহের লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং, বজবজ বনগাঁ, নৈহাটি, রাণাঘাট, ডানকুনি, এককথায়, শহরতলির প্রতিটি স্টেশনেরই নিত্যযাত্রীরা আতঙ্কিত। এই আতঙ্কের সঙ্গে আবার বাড়তি পাওনা নোংরা পরিবেশ। শহরতলীর কটা স্টেশন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন রেল কর্তারা তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন? রেলের জায়গা দখল করে চলেছে রমরমা ব্যবসা। প্লাটফর্মগুলোতো বাজারের রূপ নিয়েছে। নামই হয়ে গিয়েছে স্টেশন বাজার।

শিয়ালদহ স্টেশনে দয়াকরে যে কোন দিন সন্ধ্যের পর একবারটি সারপ্রাইজ ভিজিট করে যান না রেলমন্ত্রী। দেখবেন তাঁর সাধের স্টেশনে কি সুন্দর বাজার বসেছে। এগুলো কাদের মদতে হচ্ছে? শুধু নয়া দিল্লি স্টেশনটিকে দেখলেই কি চলবে? রেলমন্ত্রী যদি একবারটি হাজির হন হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশনে তাহলে দেখবেন, যাত্রীদের কি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে যাতায়াত করতে হয় নিত্যদিন।

রেলমন্ত্রী না এলেও গত ২৪ জুলাই শিয়ালদহ স্টেশন ঘুরে গেলেন এক রেলকর্তা, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের যাত্রী পরিষেবা কমিটির সদস্য বি. এস. তালওয়াদি। স্টেশনের যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সরজমিনে তদন্ত করে গেলেন, এমনকি রেলের স্টলগুলিতে যেসব জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে সেগুলিরও গুণগত মান ঠিক আছে কি না, প্লাটফর্মের হকারদের যথাযথ লাইসেন্স আছে কিনা, ডরমিটরিতে বিছানাপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, স্টেশন চত্বর আবর্জনা মুক্ত আছে কিনা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সবই পর্যবেক্ষণ করে গেলেন।



জঙ্গলে ঢাকা এই সেই সুভাষ গ্রাম স্টেশন ছবি ঃ সন্দীপ দত্ত

ক্ষণিকের পর্যবেক্ষণ ক্ষণিকেই শেষ। কেননা, রেলের পরিকাঠামোই আবর্জনা মুক্ত নয় বলেই নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ।

অবশ্য এ ব্যাপারে শিয়ালদহ শাখার স্টেশন ম্যানেজার কে. কে. চৌধুরি জানান, শিয়ালদহ যে আবর্জনা মুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ স্টেশন হিসেবে বিবেচিত, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে কি, ভারতবর্ষের সবচেয়ে ব্যস্ত স্টেশন। যেখানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে। এর ওপর হকারদের উপদ্রব আর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপক চাপ। আবর্জনার মূল কারণ তো হকাররাই। আর সেই সঙ্গে বলতে কোন দ্বিধা নেই রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী গোষ্ঠী। বৈঠকখানা বাজারের ব্যবসায়ীরাতোই শিয়ালদহের তিনটি শাখাতেই নরককুন্ডের অবস্থার সৃষ্টি করে। এটা যেন তাদের পারমানেন্ট পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা। ট্রেনগুলো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেই সুযোগে সারাদিন রাত ধরে সুযোগ খুঁজে ওরা ওদের নিত্যকর্ম মেটায়। দুর্গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হবে, প্লাটফর্মে নিত্যযাত্রীরা ট্রেনের জন্য দাঁড়াতে পারবে না, এসব জ্ঞান তাদের থাকলেও, জেনেশুনে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। আসলে দরকার 'পাবলিক রেজিস্টেন্ট'। পাবলিক ট্রেন লেট রানিং হলে 'অবরোধ' করতে যতটা তৎপর, আবার ততটাই অনাগ্রহী ট্রেনে কাঠ তোলা, চালের বস্তা তোলা দেশী মদ তোলাও কেরোসিন তেল তোলার ব্যাপারে। আবর্জনার ব্যাপারে হকারদের অবদানের শেষ নেই। প্রতিদিন শিয়ালদহে ৬০ থেকে ৭০ গাড়ি আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। ১৬০ থেকে ১৭০ জন সুইপার তিনটে সিফ্‌টে কাজ করে। অবশ্য

◆ ◆ ◆
প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ থেকে ১৪ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে। এর ওপর হকারদের উপদ্রব আর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের ব্যাপক চাপ। আবর্জনার মূল কারণ তো হকাররাই। আর সেই সঙ্গে বলতে কোন দ্বিধা নেই রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী গোষ্ঠী।
◆ ◆ ◆

সুইপাররাও মাসের মাইনেটা পেলেই মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে থাকে। ওদের নাকি কিছু করার থাকে না। যেহেতু নোংরা ঘাঁটতে হয়, তাই মদ ওদের খেতেই হবে। আবর্জনা মুক্ত প্লাটফর্ম ও নিত্যযাত্রীদের অবাধে চলাফেরার জন্য, লাইসেন্সহীন হকারদের উপদ্রব, রাজনৈতিক দাদাদের উপদ্রব ও সর্বোপরি মানুষের সচেতনতা না এলে কোনক্রমেই এ কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা শিয়ালদহ স্টেশনে যা শৌচালয় আছে—ভারতবর্ষের কোন স্টেশনেই এত শৌচালয় নেই।

কলকাতার ফুটপাত দখলমুক্ত করার পর, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে বে-আইনি দখলদার, বে-আইনি স্টল এবং ভবঘুরেদের হটিয়ে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগ য়ে শুধুমাত্র হাওড়া ও শিয়ালদহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। এই দুই শাখার বিভিন্ন স্টেশনও দখলমুক্ত করে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করা হবে। প্রথম দফায় হাওড়া শাখার বর্ধমান পর্যন্ত ও শিয়ালদহ উত্তর ও দক্ষিণ শাখায় ব্যারাকপুর ও বারুইপুর পর্যন্ত চলবে আপারেশন সানসাইনের মত স্টেশনে স্টেশনে বাটার অপারেশন। যাত্রী পরিষেবার দিকে তাকিয়েই এই ব্যবস্থা। এখন প্রশ্ন শিয়ালদহ ফুটপাথ কি দখলমুক্ত? রেল স্টেশন অপরিষ্কার ও বে-আইনি দখলদার অর্থাৎ হকার মুক্ত করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের (সি. আই. টি. ইউ সমর্থিত) শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সভাপতি তপন সাহা ও সম্পাদক সুনীল চন্দ্র দাস জানান, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ১৩০ জন স্থায়ী হকার ও রানিং হকার ১১ জন। সাউথ স্টেশনে ভ্যাট থাকে মাত্র দু থেকে তিনটি। স্টেশনে রেল পুলিস ও রেলকর্তাদের মদতেই বসে প্লাটফর্ম জুড়ে বাজার। ভিখিরিদের বসবাসের একটা পাকা আস্তানা এই স্টেশন। পায়খানা, প্রস্রাব সবই প্লাটফর্ম ও লাইন জুড়ে চলে। রেলের সুইপারগুলো মদ খেয়ে চুড় হয়ে থাকে দিন রাত। তবে কি এদেরও উপড়ি আয় কম নয়। রেলের কাজ তো আর করতে হয় না তাই প্রাইভেট টিউশানির মত আর প্রাইভেট ডাক্তারি প্রাকটিসের মত এরাও প্রাইভেট কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই নাম কাওয়াস্তে একবারটি প্লাটফর্মে ঝাড়ু দেওয়া আর সেই সব আবর্জনা লাইনে ফেলে দিলেই কাজ শেষ। ঠিক যেন ঘর ঝাঁট দিয়ে, ঘরের কোণেই নোংরা জমাবার পদ্ধতি। এতে দুর্গন্ধ হবে না? সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর আসবে না? সুতরাং রেল কর্তাদের চোখের সামনেই তো এ ঘটনা ঘটছে। প্লাটফর্মে এক হাঁটু পচা জল। মশা, মাছি, বমি, পায়খানা, থুথু কিনা নেই। দুটি লাইনের মাঝে হাইড্রেনগুলোয় ব্যাঙাচি

আর মশার বাসা অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসবে একবার স্টেশন চত্তরে একমুহূর্ত দাঁড়ালে। শহরতলির প্রতিটি স্টেশনেই সুইপার রয়েছে। অথচ কোন স্টেশনেরই বাথরুম, পায়খানা ব্যবহারযোগ্য নয়। অপরিচ্ছন্নতাই স্টেশনগুলোর ঐতিহ্য, কোন জলের ব্যবস্থা নেই, পায়খানা, বাথরুমগুলোর দুর্গন্ধ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা রেলকর্তারা কি জানেন না? নাকি সেগুলোও নোংরা করেছে হকাররা? আসলে রেলকর্তারা দায়সারা কথা বলতেই অভ্যস্ত। নিত্যযাত্রীরা খাবার জল পান না। নাকে রুমাল দিয়ে স্টেশনে ঢুকতে হয়। দশ নম্বর ও চোদ্দ নম্বর প্লাটফর্মতো ভিখারীদের পায়খানা। লক্ষ-লক্ষ মানুষের এই অসুবিধার কথা কি রেলকর্তৃপক্ষ জানে না? সন্ধ্যার পর রেলপুলিসের মদতেই তো বাজার বসে। আনাজের খোসা বস্তা-বস্তা সবইতো এরাই ফেলে। এছাড়া রেলের হকাররাও তো তাদের নির্দিষ্ট জায়গার অনেক বেশি জায়গা দখল করে রেখে নিত্যযাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। রেলের লাইসেন্সহীন হকাররা তো ৪'—৪' জায়গা নিয়ে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করে। রেল মাঝে এইসব হকারদের জন্যও স্টেশন জঞ্জাল মুক্তর জন্য মাদার ডেয়ারি পয়েন্টের কাছে দঃ শাখার পাশে ২৯ কাঠা জায়গায় বসার ব্যবস্থার চেষ্টা করেছেন। রেল তাদের সব শর্ত ঠিকমত মানতে না পারায় আমরা আবার উঠে এসেছি। শিয়ালদহের মোট ১২৫০ জন হকারের বিকল্প ব্যবস্থা না করা হলে হকাররা স্টেশন থেকে উঠবে না। সিটু নেতাদের এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

শিয়ালদহ নর্থ ও মেন শাখার এই সিটু ইউনিয়নেরই সম্পাদক দীপক রঞ্জন পালকে, রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর আগামী পদক্ষেপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় উনি জানান, বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদ অভিযানকে কোন মতেই সায় দেওয়া যায় না। শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেই হবে না। আগে প্রয়োজন বিকল্প ব্যবস্থার তারপর উচ্ছেদ। ততদিন হকাররা রেলের জঞ্জালই থাকবে।

হাওড়া স্টেশনে রেলওয়ে হকার্স কংগ্রেসের সম্পাদক লালি সিং এর অভিব্যক্তিটি ভারি চমৎকার। লালি সিং বললেন, রেলের ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়লেও হকারদোষ হয় আর আবর্জনা, নোংরা, এতো হবেই হকারদের নামে দোষ। সুভাষবাবু বড় মন্ত্রী, ওপর তলার

◆ ◆ ◆

স্টেশনে রেল পুলিস ও রেলকর্তাদের মদতেই বসে প্লাটফর্ম জুড়ে বাজার। ভিখিরিদের বসবাসের একটা পাকা আস্তানা এই স্টেশন। পায়খানা, প্রস্রাব সবই প্লাটফর্ম ও লাইন জুড়ে চলে। রেলের সুইপারগুলো মদ খেয়ে চুড় হয়ে থাকে দিন রাত।

◆ ◆ ◆

লোক, বিশাল ক্ষমতা। উনি যা মনে করেন তাই করেন। হয়তো দেখবেন, কোনদিন বলে বসবেন, নিত্যযাত্রীদের হটাও, কেননা ট্রেনে ভীষণ ভিড় হচ্ছে, নোংরা হচ্ছে প্লাটফর্ম। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকতে তখন পশ্চিমবঙ্গের বামমন্ত্রীরা খুব তৎপর হয়েছিলেন। অনেক বিপ্লব দেখিয়েছিলেন লাইসেন্সহীন হকারদের লাইসেন্স দিতে হবে বলে। আজ তো কেন্দ্রে ওনাদের বন্ধু সরকার। যান লাইসেন্স করে আনুন। আজ কিনা হকাররা রেলের জঞ্জাল। ভাবতেও

◆ ◆ ◆

সুভাষবাবু বড় মন্ত্রী, ওপর তলার লোক, বিশাল ক্ষমতা। উনি যা মনে করেন তাই করেন। হয়তো দেখবেন, কোনদিন বলে বসবেন, নিত্যযাত্রীদের হটাও, কেননা ট্রেনে ভীষণ ভিড় হচ্ছে, নোংরা হচ্ছে প্লাটফর্ম। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকতে তখন পশ্চিমবঙ্গের বামমন্ত্রীরা খুব তৎপর হয়েছিলেন। অনেক বিপ্লব দেখিয়েছিলেন লাইসেন্সহীন হকারদের লাইসেন্স দিতে হবে বলে। আজ তো কেন্দ্রে ওনাদের বন্ধু সরকার। যান লাইসেন্স করে আনুন।

◆ ◆ ◆

আবাক লাগে। এসব না করে বরং রেলের চুরি বন্ধ করা, সময় মতো ট্রেন চলাচলের জন্য বিপ্লব করুন। তাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হবে। হাওড়া স্টেশনে অবশ্য হকারদের দুটি ইউনিয়ন সি, আই, টি, ইউ ও আই, এন, টি,·ইউ, সি, হকারদের সমস্যার ব্যাপারে একমত। এতটুকু বিরোধ নেই এদের মধ্যে। হাওড়া স্টেশনে ১ থেকে ২১ নং প্লাটফর্ম পর্যন্ত সি, আই, টি, ইউ সমর্থিত হকারের সংখ্যা ৭১৩ জন আর আই, এন, টি, ইউ, সির ২৫৯ জন। এ তথ্য জানালেন, হাওড়া স্টেশনে পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক উত্তম লাহিড়ি। উত্তমবাবু জানান, লাইসেন্সহীন হকাররা স্টেশনমুক্ত হলেই কি জঞ্জাল মুক্ত হবে স্টেশন? এ ধারণা ভুল। ঠিকাদারই চালায় এই স্টেশনের লাইসেন্সযুক্ত স্টলগুলি। রেলের অনুমোদিত স্টলগুলি নিয়ম মেনে প্লাটফর্ম দখল করে নেই। এখানে অনেক টাকা খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপার থাকে। স্টেশনে ১—১৪ নং প্লাটফর্মের মধ্যে রেলের অনুমোদিত কাপড়ের দোকান ১ টি। স্টেশনারি ২ টি, চায়ের স্টল ২৪টি, ওষুধের দোকান ১টি, মিস্টির ট্রলি ৬টি, চায়ের ট্রলি ১৬টি, কোল্ডড্রিঙ্কসের দোকান ২৮টি, সিগারেটের দোকান ১টি, সিগারেটের ট্রলি ৩০টি, কোয়ালিটি আইসক্রিম ১টি, এছাড়া হুইলারের স্টল ১৫টি, ট্রলি ১০টি, আইসক্রিমের গাড়ি ১২টি ছাড়াও ভেজ ও ননভেজ রেস্টুরেন্ট, কফিকর্ণার রয়েছে। এতগুলো অনুমোদিত স্টলের নোংরাগুলো কি রেল কর্তৃপক্ষ দেখতে পাননা? হকারদের (লাইসেন্সহীন) তাদের মাল পত্র অবশ্যই বেচা কেনার পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া উচিত। এটাই নিয়ম। তবে একথাও ঠিক এইসব হকাররাই বরং স্টেশন পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে, নিত্য যাত্রীদের সহযোগিতা করে ও যে কোন বিপদে এগিয়ে যায়। পরিবহনমন্ত্রীর রেলওয়ে হকার অপারেশনের মন্তব্যে সিটু নেতা উত্তম বাবু জানান, জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য প্লাটফর্ম দখলদারীদের উচ্ছেদকে সমর্থন করলেও এটুকু অবশ্যই বলতে পারি, এই অপারেশনে জঞ্জালমুক্ত কতটুকু হবে তা বাস্তবিকই সন্দেহের ব্যাপার। মাঝমধ্যে বেশ কিছু নিরীহ হকারদের ওপরে অবশ্যই আঘাত আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি 'অপারেশন বাটার'-এর মাধ্যমে সম্ভব হবে।

আঠারো পাতায় শেষাংশ

অভাব। প্রত্যক্ষদর্শী থেকেও নেই। একইভাবে সম্প্রতি অশোকনগরের সি পি এম নেতা কালীপদ সরকারের খুনের ঘটনাকে রাজনৈতিক হানাহানির কাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন গোয়েন্দারা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সি পি এমের দুই শীর্ষ নেতার অনুগত সমাজবিরোধীদের মধ্যে বখরার গোলমালের জেরেই কালীপদ সরকার খুন হয়েছে বলে গোয়েন্দা পুলিশ রাজ্য সরকারকে তাঁদের 'গোপন রিপোর্ট' দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছে। আর বেশিদূর এগোয়নি। গোয়েন্দাদের ক্ষোভ, অশোকনগরের ঘটনা নিয়ে রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগের অভিযোগ আনলেও তাঁদের কাছে খুনীদের সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকলে পুলিশকে জানাচ্ছেন না। একইভাবে সুশীলবাবুর খুন সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতারা সাহায্য না করায় সেই হত্যারহস্যের জট খোলেনি। তাঁদের মতে, দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দানের প্রবণতা শুরু হতেই মামলা সাজাতে অভাব ঘটছে প্রত্যক্ষদর্শীর। ফলে নানান অপরাধের ঘটনা বাড়তে থাকবে। এখনই শক্ত হাতে হাল না ধরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা।

বামফ্রন্ট জামানার গত বিশ বছরে থানাগুলো সম্পর্কে মানুষের ধারণা মোটেই বদলায়নি। কলকাতায় তবু মানুষ থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। জেলায় জেলায় থানার ওপর মানুষের সেই আস্থাটুকুও নেই। পুলিশের ওপর তলাতেও রয়েছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে থানায় থানায় পুলিশি রাজনীতি। দক্ষিণ কলকাতায় একটি থানায় তো কিছুদিন আগে ও সি আর অতিরিক্ত ও সি-র মধ্যে প্রকাশ্যে মারপিটের ঘটনাও ঘটেছে। সাধারণ মানুষ তো পুলিশের ওপর ন্যূনতম বিশ্বাসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। তার ওপর রয়েছে পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। মস্তানদের রিভলভার বা ভোজালির আস্ফালন। অতএব আগামীদিনেও চোখের সামনে কোনও ঘটনা ঘটলে চোখ বুঁজে ফেলতে হবে সাধারণ মানুষকে। বুক হিম করা দৃশ্য দেখার পর নাগরিকদের বিবেক জাগ্রত হবার সুযোগ দেয় না কেউ। কারা যেন কানের পাশে হিস হিস করে চাপা শব্দ তোলে ঃ 'আপনি কিছুই দেখেননি।' মিছিলের মুখকে নীল করে দেয় ঃ 'আতঙ্কবাদ'।

সাক্ষ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক ঃ হরিপদ কর

(অবসরপ্রাপ্ত দায়রা বিচারক)

প্রশ্ন ঃ কেউ কোনও ঘটনা দেখলে পুলিশ যদি তাকে সাক্ষী মানে তাহলে তার সাক্ষ্য দেওয়া কি আবশ্যিক? আইন কি বলে? সাক্ষী যদি না দেয় তাহলে তার কি সাজা হয়?

উত্তর ঃ ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৬০ ধারা বলে পুলিশ যে কোন লোককে সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারে এবং ওই আইনের ১৬১ ধারার বলে তার সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে পারে। কিন্তু সেই সাক্ষ্য সোজাসুজি আদালতে গ্রাহ্য হয় না। তবে ওই আইনের ১৬২ ধারার প্রভাইসো অনুসারে ওই সাক্ষীর কোর্টে দেওয়া সাক্ষ্যকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে জেরার সময় আসামী পক্ষ এবং আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারি পক্ষ ও পুলিশের কাছে দেওয়া সাক্ষ্য ব্যবহার করতে পারে।

পুলিশ বা আদালত যেখান থেকেই ডাক আসুক সাক্ষীকে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। অন্যথায় অনুপস্থিতির জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১৭৪ ধারায় ও সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য তার ওই আইনের ১৭৯ ধারায় জেল, জরিমানা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষীকে আইনে এত প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন? মিথ্যে সাক্ষী দিয়েও তো লোকে একজনকে জেল খাটাতে পারে? এমন ঘটনা কি হয় না?

উত্তর ঃ বেশির ভাগ ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত অপরাধে কাগজ পত্রের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ওপরে নির্ভর করতে হয়। প্রত্যক্ষদর্শী না পাওয়া গেলে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সূত্রগুলি পর পর শিকলের মত সাজিয়ে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ঘটনা প্রমাণিত বলে গ্রাহ্য হতে পারে এবং আসামীর শাস্তি হতে পারে। সাক্ষীরা যাতে সত্য কথা বলে তার জন্য তাদের শপথ নিতে হয়। ধরা হয় কেউ শপথ করলে মিথ্যে কথা বলবে না। সাক্ষী মিথ্যে কথা বলছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে জেরা করে এবং নানা কোণ থেকে প্রশ্ন করে, তার সাক্ষ্যের ত্রুটি বিচ্যুতি আদালতের সামনে হাজির করে। যদি সরকারি পক্ষের সাক্ষী বানানো বা শেখানো কথা বলে, তবে প্রবল জেরার মুখে সে শেখানো কথা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

তবে, এতসব সাবধনতা সত্বেও অনেক সময় দেখা যায় নিরপরাধ লোকের শাস্তি হয়েছে। যথার্থ অপরাধী বহুকাল পরে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে অনেক সময়ে খবরের কাগজে সংবাদ ও প্রকাশ হয়।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষীর কি কোন বয়স আছে? শিশুর সাক্ষী কতখানি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ শিশুরাও সাক্ষী দিতে পারে যদি কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আদালত বোঝেন যে, সে প্রশ্ন বুঝে বুদ্ধির সাহায্যে তার উত্তর দিতে সমর্থ। এ সম্পর্কে কোনও বয়সের বাধা নেই।

প্রশ্ন ঃ হোস্টাইল সাক্ষী কাকে বলে?

উত্তর ঃ অনেক সময় দেখা যায় সাক্ষীরা বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তাকে হোস্টাইল হিসাবে ঘোষণা করে যে পক্ষ সাক্ষীকে ডেকেছে সে আদালতের অনুমতি নিয়ে তাকে জেরা করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষীর কাঠগোড়ায় একজনকে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু তাকে কিছু বলতে বাধ্য করা যায় কি?

উত্তর ঃ সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায়। কেন্না, সাক্ষ্য না দিলে তার জেল জরিমানা হতে পারে। কিন্তু ভয়ে ভয়ে সাক্ষী সত্য কথা বলতে চাইবে না। অবশ্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে প্রমাণিত হলে তার জেল, জরিমানা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সাক্ষীর নিরাপত্তার জন্য কোনও আইনি বিধান আছে কি?

উত্তর ঃ জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যে সব আইনের বিধান আছে সাক্ষীর ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য। এছাড়া 'কনটেমট অফ কোর্টস অ্যাক্ট' অনুসারে সাক্ষীকে ভয় দেখানো বা তার নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে আদালত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

লেইজর রশ্মির রহস্য

দিলীপ ভৌমিক, ওয়াশিংটন।

বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে যে দুটো আবিষ্কার বিজ্ঞানের জগতে যুগান্তর এনেছে, তার মধ্যে প্রথমটি হলো কম্পিউটারের "মাইক্রোচিপস্"। "ভাল্ব সেট্" হলো "ট্রানজিস্টার" তারপর এলো "মাইক্রোচিপস্"। মাইক্রোচিপস্" অনতিবিলম্বে পুরোনো কম্পিউটারের আয়তনকে এক দশাংশ করে দিল। দ্বিতীয় আবিষ্কার হলো "লেইজর রশ্মি"। এই "মাইক্রোচিপস্" ও "লেইজর" রশ্মি মানুষের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করছে। বিশ্বের প্রায় নব্বইভাগ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিই আজ এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের প্রযুক্তিতে চলে। লেইজর রশ্মি সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তো ধারণা আছে, তবে এর প্রকৃত ব্যবহারের দিকটা সবার জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞান যেভাবে এগোচ্ছে এর প্রযুক্তিও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। বিশ্বে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা যাবতীয় কাজে এই লেইজর রশ্মির প্রয়োগ মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন পথে চালিত করেছে।

"এক্সরে" বা রঞ্জনরশ্মি যেমন অদৃশ্য, লেইজর রশ্মি কিন্তু সেরকম অদৃশ্য নয়। টর্চলাইটের মত এর কিরণ রয়েছে, এর দীপ্তি অনেক প্রখর এবং এর তীব্রতা অনেক বেশী। এই রশ্মির অবস্থিতি ১৯১৭ সালে জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনস্টাইন আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন, কিন্তু একটা যন্ত্রের অভাবে এই তত্ত্বকে চাক্ষুষ রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকায় কালিফোর্ণিয়ার হিউজেস কোম্পানির পদার্থবিদ ডঃ থিওডোর সেইমেন একটা যন্ত্রের সাহায্যে ১৯৬০ সালে এই রশ্মির অবস্থিতি আবিষ্কার করেন। একটা ছোট রুবি রডের ওপর ফ্লোরেসেন্ট লাইটের টিউবের মত দেখতে একটা নল পাকিয়ে নিয়ে ঐ নলের ভেতর দিয়ে অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলক এক একটা স্পন্দনে দেওয়া হয়। কোন 'স্যাফায়ার' বা নীলকান্তমণির ওপর সামান্য ক্রেমিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ দিলে সেটাকে "রুবিরড লেইজর" বলে। লেইজর কথাটা একটা "অ্যাক্রনিম" বা সমষ্টিবাচক শব্দ। অনেকগুলো কথা বা শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই "লেইজর" শব্দ গঠিত। ইংরেজিতে এর পুরো কথাটা হলো "লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন।" বাংলায় বলতে পারি "উত্তেজিত বিকিরণের প্রবাহে আলোর সম্প্রসারণ"। স্পন্দনে-স্পন্দনে আলো ফেলে রুবিরডকে একপাশে আয়না ও অন্যপাশে আংশিক আয়না রেখে আলোকপুঞ্জকে ত্বরান্বিত ও সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধন করা হয়। অবশেষে সেই আয়নাজোড়ার আংশিক আয়নার ভেতর দিয়েই সূক্ষ্ম অথচ উজ্জ্বল রক্তাভ "লেইজর" বেরিয়ে আসে। এই আবিষ্কারে পর বিজ্ঞানীর তরল, বায়বীয় পদার্থের মাধ্যমে প্রায় শতাধিক "লেইজর" রশ্মি বার করলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই রশ্মির রঙ ও এর বর্ণালী এবং এর কর্মক্ষমতা অত্যন্ত অল্প দিনেই সবার দৃষ্টিআকর্ষণ করলো।

বর্তমানে লেইজর রশ্মির ব্যবহার সংখ্যাতীত। এর ব্যবহার গুণে শেষ করা যাবে না। আগেই বলেছি কাজ ছাড়াও এর ব্যবহার সর্বমুখী। চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। চিকিৎসায় বেশী যে লেইজর রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে রুবিলেইজর, এনডি-ওয়াই-এ-জি, আরগণ ও ক্রিপ্টন্ লেইজর সর্বত্র সমাদৃত। এই রশ্মির যান্ত্রিক ব্যবহারের সাহায্যে কোন কিছুর গতি ও দুই স্থানের নির্ভুল দূরত্ব নির্ণয় করা খুব সহজ হয়ে পড়েছে। তরল ও বায়বীয় পাদার্থের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা এই লেইজরের সাহায্যেই নির্ভুল করা সম্ভব। আলোর গতির পরিমাপ প্রতিসেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। এই রশ্মির সাহায্যেই সূক্ষ্মভাবে বিচার করা সম্ভব। শিল্প, বাণিজ্য ও শুশ্রষায় এর ব্যবহার অপরিসীম। শক্তিশালী লেইজরের সাহায্যে এখন কারখানায় ইস্পাত অথবা যেকোন ধাতুকে মসৃণ ভাবে কাটা সম্ভব হয়েছে। কাপড়-জামা তৈরির কারখানায় তখন একই মাপের একাধিক কোট অথবা প্যান্টের কাপড় এক নিমেষে এই রশ্মির সাহায্যে কাটা যায়। বর্তমান চিকিৎসা কেন্দ্র চোখের অস্ত্রোপচারে এর ব্যবহার দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। "ফাইবার অপ্‌টিক্স্" এর (বিশুদ্ধ কাঁচের তৈরি সূক্ষ্ম তার) মাধ্যমে লেইজর রশ্মি প্রবাহিত করে বিশ্বের টেলিফোন ও অন্যান্য জনসংযোগে এক যুগান্তর এসেছে। "থ্রি-ডাইমেন্সনাল" ছবিও এই রশ্মির সাহায্যে করা হচ্ছে। এ জাতীয় ছবি তৈরিকে "হলোগ্রাফি" বলা হয়। এছাড়া সি. ডি. রমে গানের রেকর্ড চালাতে এই রশ্মির ব্যবহার অপরিহার্য। ইদানীং দন্ত চিকিৎসায় এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। দাঁতের প্রধান শত্রু "ক্যারিস্" বা দন্তক্ষয় নিবারণের পক্ষে এই রশ্মি খুব কার্যকরী।

সার্ক ফুটবলে নঈমের অগ্নিপরীক্ষা

অরূপ পাল

ঢাকা মীরপুর স্টেডিয়ামে ভারতের ড্রেসিংরুমে একেবারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ১৯৯৬ এর ২৬ ডিসেম্বর। সার্ক ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন নেপাল। দু-দুবার পিছিয়ে পড়েও নেপাল সেদিন টাইব্রেকারে ভারতকে ৬-৫ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শুধু তিরানব্বইয়ের মরসুমেই নয়, চুরাশিতেও কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক গেমসেও নেপাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশকে ১-০ গোলে হারিয়ে। দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও সার্ক ফুটবলে একবার রানার্স হয়েছে নেপাল। সাতাশিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সার্ক গেমসে ভারত বাবু একমাত্র গোলে হারায় নেপালকে। আটের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একচেটিয়া প্রাধান্য দেখিয়ে আসা ভারতও তিরানব্বুইতে লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক ফুটবলে বিজয়নের গোলে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেও, পঁচানব্বইয়ে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সার্ক ফুটবলের ফাইনালে ভারত সোনালি গোলে হেরেছিল শ্রীলঙ্কার কাছে। বিশ্বকাপ, অলিম্পিক, এশিয়াড দূর অস্ত। ভারতীয় ফুটবলারদের সোনার পদক পাওয়ার একমাত্র সুযোগ সার্ক গেমস এবং সার্ক ফুটবলে ভারত তিন বার সোনা পেয়েছে। যারমধ্যে তারা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিজেদের মাঠে। দু'বছরপরে সার্ক ফুটবলেও সোনার হার ভারতীয় ফুটবলাদের গলায় ঝুলছে কিনা তা নিয়ে চিরন্তন চলছে জল্পনা-কল্পনা। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে, মাঝে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরই নেপালে শুরু হয়ে যাবে তৃতীয় সার্ক টুর্নামেন্ট। দশদিন ধরে চলবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং নেপালের মধ্যে সোনা জেতার রুদ্ধশ্বাস লড়াই। মাদ্রাজে সাফ গেমসে পর গত দু'বছরে কোন দেশ ফুটবলে কতটা উন্নতি করল সেই চিত্রটা আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে যাবে সকলের সামনে। তাই এই ৬ টি দেশের মানুষের নজর এখন নেপালের দিকে। আর পাঁচটা দেশের মতো প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক করে প্রস্তুত কোটি ভারতীয় দলের ফুটবলাররাও। নব্বই কোটি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা বাইচুং, আই এম বিজয়নকে ঘিরেই। সদ্য সমাপ্ত নেহেরু গোল্ড কাপে ভারতীয় ফুটবলারদের লড়াই দেখে মনে হচ্ছে সার্ক ফুটবলে ভারতের সোনা জয়টা শুধু সময়ের অপেক্ষা। নেহেরু গোল্ড কাপের ফর্ম যদি বিজয়ন-বাইচুংরা দেখাতে পারেন তবে সার্ক ফুটবলে সোনা জিততে ভারতের অসুবিধা হবে না। সাফ ফুটবলে ভারত সোনা জিতেছিল একজন বিদেশী কোচের হাত ধরে। সার্ক ফুটবলে তাই ভারতীয় কোচ নঈমউদ্দিনের কাছে অগ্নি-পরীক্ষা। এটা জানেন বলেই বোধহয় দোণাচার্য সার্ক ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে খুব চিন্তিত। দোণাচার্যের প্রতিটি পদক্ষেপেই বোঝা যাচ্ছে। নেপালের আবহওয়ার সঙ্গে মানানসই হওয়ার জন্যে তিনি ভারতীয় দলের শিবিরটি করেছেন কালিংপঙে। ভারতীয় ফুটবলে যা অভিনব। এমনকি নঈমের এবারের দল নির্বাচনের ব্যাপারের তেমন কোনও প্রশ্ন তোলার উপায় নেই। এক কথায় বলা যায় নিঁখুত। ফরোয়ার্ডে ভারতীয় দলের ভরসা যদি বিজয়ন, বাইচুং হন, তবে মাঝমাঠে নঈমের ভরসা ব্রুনো কুটিনহো। ডিফেন্সও এবার যথেষ্ট মজবুত সবচেয়ে বড় কথা নেহেরু কাপেরসময় ভারতীয় ফুটবলাররা ছিলেন ক্লান্ত। এবার কিন্তু তারা পুরোপুরি সুস্থ এবং ফিট, এজন্যেই বোধহয় ভারতীয় দলের কোচ সার্ক টুর্নামেন্টে সোনা জেতার ব্যাপারে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী। ভারতের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আরেক দাবিদার হল আয়োজক দেশ নেপাল। নেপাল দলে মারাদোনা নেই। নেই বাইচুং বা বিজয়ন। তবু বেশ খানিকটা সমীহ করতে হচ্ছেই নেপালকে। বিশেষ করে টুর্নামেন্টটার পত্তন ওদের দেশে। দক্ষতার ঘাটতি বরাবরই ওঁরা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে আন্তরিকতা দিয়ে। গত কয়েক বছর ট্র্যাক রেকর্ড দেখলেই তা মালুম হবে। সাফ গেমসেই শুধু নয়, গত কয়েক বছর ধরে নেপালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন টুর্নামেন্ট থেকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ফিরছে শূণ্য হাতে। এ দেখেই বোধহয় টুর্নামেন্টের আগেই নঈম নেপাল দল সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে কাঠমাণ্ডুতে গিয়েছিলেন। ভারতীয় কোচ উপলব্ধি করেছে ভারতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ফলে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নেপাল। নঈমের মতে সার্ক ফুটবেল নেপাল খেলছে নিজেদের মাঠে। ফলে পুরো সমর্থনটাই পাবে তারা। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে খেলার জন্য বোঝাপড়াটাও যথেষ্ট ভাল। প্রাক্তন ফুটবলার গনেশ থাপা নেপাল ফুটবল সংস্থার সভাপতি। সার্ক ফুটবলে এখন তাঁর কাছে বড় একটা চ্যালেঞ্জ, তাই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার তিন মাস আগে থেকেই নেপাল দলটি সার্ক ফুটবলের প্রস্তুতি শুরু করেছে। পাশাপাশি জাপান থেকে দল এনে প্র্যাকটিস ম্যাচেরও ব্যবস্থা করেছিলেন গনেশ থাপা। সার্ক টুর্নামেন্ট ভারতের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নেপালের কাছে। ক্লাব ফুটবলে ভারতীয় দলগুলিকে হারানোর পর ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে যদি ভাল কিছু করতে পারে নেপাল, তাহলে ফুটবলাদের কদর বাড়বে। আর এই মুহূর্তে নেপালের ফুটবল প্রশাসন এবং ফুটবলারদের কাছে সেটাই প্রধান লক্ষ্য। নিজেদের মাঠে খেলার সুবিধাটুকু পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগেছে নেপাল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন নেপালের কোচ তাকিয়ে আছেন রাজু শকিৎ এবং দেবনারাণ চৌধুরীর দিকে। দেবানারায়ণ গত মরশুমে ইস্টবেলের জার্সি গায়ে খেলছেন। ফলে ভারতীয় ফুটবালারদের দোষ-গুণ সবই তাঁর জানা। সার্ক ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে নেপালের বড় বাধা টপকাতে হবে বাইচুং-বিজয়নদের। 'ডার্কহর্স' সব টুর্নামেন্টেই কেউ না কেউ থাকে। গত বিশ্বকাপ ফুটবল সম্রাট স্বয়ং পেলে। আর পেলে কিছু বলা মানে তো তার সঙ্গে গলা

শেষাংশ তিরিশ পাতায়

দন্ত নিয়ে তদন্ত

'দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'—এই প্রবাদবাক্যটি আমাদের সকলের কাছেই খুবই পরিচিত। কথাটির অর্থ হল—দাঁত থাকতেই দাঁতের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা অচিরেই সেগুলো হারাতে হতে পারে। দাঁত দিয়ে রক্তপড়া, অসহ্য যন্ত্রণা, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ, মাড়িতে পচন ধরা ইত্যাদি তো আছেই, এছাড়াও আছে দাঁতে টিউমার, সিস্ট এমনকি মাড়িতে ক্যান্সার পর্যন্ত।

এখনও পর্যন্ত অনেকের ধারণা, যে ডেন্টাল ক্লিনিক বা ডেন্টাল হাসপাতালে শুধুমাত্র দাঁত তোলা ও দাঁত বাঁধানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনে সমগ্র মুখমণ্ডলের চিকিৎসাই হয়ে থাকে।

দাঁতের এই রোগ ও তার চিকিৎসা কিন্তু নতুন কিছু নয়। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বৎসর আগেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই রোগ ও তার চিকিৎসার উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালের সুবিখ্যাত গবেষক-চিকিৎসক চরকের লেখাতেও ৬৪ রকমের 'মুখরোগের' কথা জানা যায়। অতি প্রাচীনকালেও চিন দেশে দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ব্রাশ ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল।

বর্তমানে এই মুখরোগের বিষয়ে কি কি ধরনের গবেষণা বা চিকিৎসা হচ্ছে জানতে আগ্রহী হয়ে আসা গেল কলকাতার একমাত্র ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল—'ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল'-এ। ঠিকানা - ১১৪ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কিন্তু ১৯২০ সালে প্রথম যখন এই ডেন্টাল কলেজটি তৈরি হয় তখন তার ঠিকানা ছিল ২৬১ বউবাজার স্ট্রিট। মাঝে একবার বউবাজার স্ট্রিটেরই ৩৩নং বাড়িটিতে হাসপাতালটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। মূলতঃ ডঃ আহমেদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠায় এই হাসপাতালটি তৈরি হয়। ডঃ রফিউদ্দিন আহমেদের ছাত্রাবস্থায় ভারতবর্ষে দন্ত-বিষয়ক চিকিৎসার জন্য বা গবেষণার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। দাঁতের রোগের চিকিৎসা করত কিছু হাতুড়ে-ডাক্তার। ডঃ আহমেদ আমেরিকা



গিয়ে দন্ত-চিকিৎসা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞান অর্জন করে ফিরে এসে এই চিকিৎসাতে সাধারণের কাজে লাগানোয় ব্রতী হলেন।

প্রথমাবস্থায় মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ করেই দু-বছরের ডেন্টাল কোর্সে ভর্তি হওয়া যেত। এছাড়া যে পৃথক পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স ছিল তাতে কয়েকজন বিশেষ মেধাবী ছাত্ররাই সুযোগ পেত। ১৪ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় দন্ত-চিকিৎসার জনক ডঃ আহমেদ কলকাতার কলেজে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেন্টাল স্কুল ও ইংলন্ডের রয়্যাল কলেজের দন্ত-বিভাগের পাঠ্যসুচির অনুরূপ পাঠ্যসূচী ও চার বৎসরের শিক্ষাবর্ষ প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি. ডি. এস. কোর্স চালু করে। বর্তমানে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় মেধাভিত্তিক ফলাফল অনুযায়ী ভর্তি হতে হয়। বি. ডি. এস পাশ করার পর পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সাতটি বিষয়ে ইন্টার্নশিপ ও হাউস স্টাফশিপ করতে হয়। এছাড়া সাতটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এম. ডি. এস. কোর্স চালু হওয়ায় এই কলেজটি বর্তমানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট হিসাবেও স্বীকৃত। ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ তপনকুমার সাহা জানালেন, এখানে সকল রোগীকেই এক টাকা করে টিকিট করতে হয়। এই টিকিট করে তাদের প্রথমেই যেতে হয় **ওরাল ডায়াগনোসিস অ্যান্ড মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে**। এখানে রোগীর অসুখ এবং অসুবিধার কথা চিকিৎসক ভাল করে শোনেন। এরপরই তাদের প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয়।

অন্যান্য বিভাগগুলির মধ্যে প্রথমেই ধরা যাক **ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বা মুখগহ্বরের, চোয়ালের ও মুখমণ্ডলের শল্য চিকিৎসা**—এখানে দাঁত তোলা থেকে শুরু করে মুখমণ্ডলের নানারকম শল্য চিকিৎসা বা অপারেশন করা হয়। যেমন দুর্ঘটনায় চোয়াল বা মুখমণ্ডলের কোন হাড় ভেঙে গেলে, বা ওপর ও নীচের চোয়ালের স্বাভাবিক নড়াচড়া কোনরকমে বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মুখের কোন হাড়ের অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বা সুন্দর করার জন্য যে অপারেশনগুলি করার দরকার হয়, তা এই বিভাগেই করা হয়ে থাকে। এছাড়া দাঁতের সিস্ট, টিউমার ইত্যাদির অপারেশনও এখানেই হয়।

এরপর আছে **পিরিওডনশিয়া** বা মাড়ি সংক্রান্ত চিকিৎসা—সাধারণতঃ মাড়ি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্তদের এই বিভাগে পাঠানো হয়। মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, মাড়ি ফুলে গিয়ে ব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ এই সমস্ত বিষয়ে চিকিৎসা ও পরামর্শ এখানে দেওয়া হয়। তাছাড়া দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে পাথরের মত শক্ত আস্তরণ পড়ে তা তোলার ব্যবস্থা থাকে। স্কেলিং-এর মাধ্যমে পাথর তুলে ফেলা তাও এখানেই করা হয়, মাড়ির ছোটখাটো সার্জারিও এই বিভাগে হয়।

পিডোনশিয়া বা শিশু দন্ত বিভাগে শিশু মনস্তত্ত্বকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে শিশুদের নানারকমের দন্তরোগের চিকিৎসা করা হয়।

কনসারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি বা দাঁত সংরক্ষণ বিভাগে বিভিন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত বা ভাঙা দাঁতকে একেবারে তুলে না দিয়ে সেগুলিকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। অ্যামালগাম, গ্লাস আয়নোমার ফিলিং ছাড়াও লাইট কিয়োর বা ইনলে পদ্ধতিও চালু আছে এখানে। দাঁতের গোড়ায় প্রয়োজনে ছোটখাটো সার্জারিও এই বিভাগে করা হয়।

প্রসথোডনশিয়া বা দাঁত বাঁধানো বিভাগ—কৃত্রিম দাঁতের সাহায্যে দাঁত বাঁধানোর কাজটি এই বিভাগে হয়ে থাকে। দাঁতের অভাবে যাদের খাওয়ার সুখটিও যেতে বসেছে তাদের মুখে কৃত্রিম দাঁত বসানোর দায়িত্ব এই বিভাগের। ক্রাউন অ্যান্ড ব্রিজ পদ্ধতি এই বিভাগে শীঘ্রই চালু হওয়ার কথা।

অরথোডনশিয়া বা বিকৃত দাঁতের গঠন সংক্রান্ত চিকিৎসা বিভাগ—আর্থিক স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আজকের মানুষ হয়ে উঠেছেন যথেষ্ট সৌন্দর্য সচেতনও। দাঁতের সুন্দর গঠন মুখকে করে তোলে আরও আকর্ষণীয়। তাই অসমান বা উঁচু দাঁতের অধিকারী মানুষগুলি ছুটে আসেন এই বিভাগে দাঁতকে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সুন্দর করার আশায়।

ওরাল প্যাথোলজি বিভাগে বিভিন্ন রকম প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

এছাড়া আলাদা করে একটা এক্স-রে বিভাগও রয়েছে এই ডেন্টাল হাসপাতালটিতে।

এখানে বর্হিবিভাগে গড়ে রোজ প্রায় চারশ-র মত রোগী আসেন দাঁতেরই বিভিন্ন রোগ নিয়ে। বর্হিবিভাগের কাজ চলে দুই শিফটে। সকাল ৯টা থেকে ১২টা আবার ১টা থেকে চারটে। তবে এখানে হাসপাতাল থেকে রোগীদের ওষুধ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে নিতে হয়।

ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজের ইন্ডোর বা অন্তর্বিভাগটি রয়েছে নীলরতন সরকার কলেজের সেন্টিনারী বিল্ডিং-এ। এখানে ডেন্টাল কলেজের ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের নিজস্ব দশটি বেড রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় যদিও সংখ্যাটি নগণ্যই। বিভাগটি ডেন্টাল কলেজেই নেই কেন জানতে চাইলে ডাঃ সাহা জানালেন, যে বড় বড় সার্জারির ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিকাঠামো ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দরকার তার ব্যবস্থা করা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। নীলরতন সরকার হাসপাতালে সহজেই এই ব্যবস্থাগুলি পাওয়া যায়। তিনি আরও জানান এই কলেজটি যথেষ্ট সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তার আক্ষেপ, হাসপাতালটির আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ জায়গার অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এখানকার চিকিৎসক-শিক্ষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থীরা যে যথেষ্ট উন্নতি করছেন ও দেশে-বিদেশে সফলতা অর্জন করছেন একথা জানাতেও ভুললেন না তিনি।

এবিষয়ে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরাও তার কথারই প্রায় প্রতিধ্বনি করলেন। ক্লাসরুমের অভাবের কথা তাদের কাছেও জানা গেল। চিকিৎসা-বিষয়ক যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের ওপরও তাঁরাও জোর দিলেন। তবে বড় কোন রকমের অসুবিধার কথা তারা বলেননি।

ডাঃ সাহা ও অন্যান্য চিকিৎসকদের অভিমত হল—রোগের চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধের উপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সময়ে দাঁত ও মাড়ির যত্ন নিলে বহুলাংশে দন্তরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। খাবার মুখের ভেতরে চিবিয়ে (বিশেষতঃ আঠালো, শর্করা জাতীয় খাদ্য) খাওয়ার সময় খাবারের কণাগুলি নেক সময় দাঁতের ফাঁকে আটকিয়ে যায়। এইগুলি মুখের থেকে বের করার ব্যবস্থা না হলে সেগুলি সেখানে পচে ওঠে। এই পচা খাদ্যকণায় ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে ও ধীরে ধীরে দাঁতের ক্ষয়সাধন করে। অতিরিক্ত চটোলেট, প্যাস্ট্রী ইত্যাদি খাবারগুলো ছোট শিশুদের দাঁতের ক্ষতি করে। এছাড়াও কিছু লোকের দাঁতের ফাঁকে তামাক রাখা বা তামাকের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজার মত কু-অভ্যাসগুলো গড়ে ওঠায় সৃষ্টি হচ্ছে দাঁত ও মাড়ির নানারকম অসুখ, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত. তাই তামাক জাতীয় নেশার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা উচিৎ।

সুস্থ দাঁত ও মাড়ি সংরক্ষণের জন্য তাই অভিজ্ঞ ডাক্তারদের উপদেশ—রোগের কারণগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। প্রত্যেকবার খাওয়ার পর ভাল করে জল দিয়ে মুখ কুলি করা দরকার। দিনে দু'বার সকালে জলখাবারের পর ও রাত্রে আহারের পর ব্রাশ সহযোগে দাঁত মাজা উচিত। ছোটবেলা থেকেই সু-অভ্যাস ও সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলেই আমরা উপহার দিতে পারব ঝকঝকে অনিন্দ্যসুন্দর দাঁতের সারির এক সুস্থ সতেজ হাসি।

❑ প্রণতা ভট্টাচার্য

আঠাশ পাতার পর

মেলানোর লোকের অভাব হবে না। এক্ষেত্রেও ঘটেনি। কিন্তু চুরানব্বইতে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কলম্বিয়ার শেষ পর্যন্ত যা করুণ হাল হয়েছিল সেটা আজ ইতিহাস। তবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নিজের মাঠে অনুষ্ঠিত সার্ক ফুটবলে নেপাল কিন্তু কলম্বিয়া হবে না। সোনা জিততে পারলে তো কোনও কথাই নেই। এমন কি আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর নেপাল নিজেদের মাঠে ফাইনাল খেলতে নামে তা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। চ্যাম্পিয়নের আরেক দাবিদার বাংলাদেশ তিনবার সার্ক ফুটবলের ফাইনাল উঠলেও তাদের ট্র্যাক রেকর্ড ভাল নয়। গত দু'বারের পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি শুরু করেছেন জার্মান কোচ অটো ফিস্টার। মুন্না, মানিকরা অবসর নিলেও একঝাঁক তরুন ফুটবলারকে নিয়ে সার্ক ফুটবলে প্রথম সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বাংলাদেৰে কোচ ফিস্টার। বাংলাদেশ, নেপাল ছাড়াও ভাল প্রস্তুতি নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। সবচেয়ে বড় কথা নেপালের মত শ্রীলঙ্কাও মালয়েশিয়ায় গিয়ে বেশ কয়েকটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে। শ্রীলঙ্কার ভরসা রোশন পেরেরা এবং আমানুল্লা। বিশ্ব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে পঁচানব্বইয়ে নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত সার্ক ফুটবলে শ্রীলঙ্কা সোনালী গোলে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। নিজের দেশের এই সাফল্য যে ফ্লুকে ছিল না এবার প্রমাণ করতে হবে রোশনদের। অন্যদিকে এশীয় ক্লাব কাপ এবং কাপ উইনার্স কাপের দুটোতেই ভারতীয় ক্লাবগুলো সম্মান-মর্যদা মালদ্বীপে রেখে এসেছিল পঁচানব্বইয়ের মরশুমে। নিজেদের দেশের মাঠে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, জেসিটি কে হারালও দেশের বাইরে তাদের সাফল্য একেবারে নেই। ক্লাব ফুটবলে হারলেও জাতীয় টুর্ণামেন্ট কখনও ভারতীয় দলকে হারাতে পারেনি মালদ্বীপ। সার্ক ফুটবলের ফাইনালে তারা একবারই উঠেছি একানব্বইয়ের মরসুমে। ফাইনালে উঠলেও তারা ০-২ গোলে হারে পাকিস্তান কাছে। ফলে এবারও সার্ক ফুটবলে সে রকম কিছু অঘটন না চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোনও আশা নেই মালদ্বীপের। সাফ গেমসে দু'বার চ্যাম্পিয়ন হলেও সার্ক ফুটবলে কেন জয় নেই পাকিস্তানের। তাই সার্ক ফুটবলে এবারও লড়াই ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যেই হচ্ছে।

অসমের আতঙ্কবাদী আলফাদের নেপথ্য কাহিনী

মৃত্যুর পূর্বদ্বার

গৌতম রঞ্জন বসু



অসম ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ছুটে চলছিল জীপটা। পুরনো, রংচটা কিন্তু শব্দহীন ইঞ্জিনে চলা গাড়ীটা ছিল বেশ মজবুত। গন্তব্য রং ঘর। অহোম রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে এখনও শিবসাগর জেলার আশেপাশে। কারেন ঘর, রংঘর তারই কিছু নিদর্শন মাত্র। মাত্র পাঁচ-ছয়শো বছর আগেও এখানে বসে রাজারা হাতির লড়াই দেখতেন। ২১শে এপ্রিল ১৯৭৯ প্রাকৃতিক দাবদাহ উপেক্ষা করেই উপস্থিত হয়েছিল কয়েকটি ছেলে, অরবিন্দ রাজখোয়া - চেয়ারম্যান, অনুপ চেটিয়া - সাধারণ সম্পাদক, প্রদীপ গগোই - ভাইস চেয়ারম্যান আর পরেশ বড়ুয়া - রেভেলিউশনারী আর্মি অফ অসমের সর্বাধিনায়ক - পরেশ।

এই রংঘরে বসেই রাজখোয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম। ইউনাইটেড' কেননা অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন-এর সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী অংশেরও কিছু যুবক, রেভেলিউশনারী আর্মি ইত্যাদি মিশে গিয়ে তৈরী হল আল্‌ফা।

১৯৭৯ থেকে ১৯৯৭— অনেকখানি সময়। ১৮ বছরের এক অপরিণত যুবক আল্‌ফা। যারা বিশ্বাস করে না সংসদীয় গণতন্ত্রে। যারা অবিশ্বাসী ভারত সরকারের সঙ্গে কোনোরকম কথা বলায়। এরা স্বপ্ন দেখে অখণ্ড অসম রাজ্যের।

আজ ১৯৯৭-এর মাঝামাঝি আসুর পুবর্তন সভাপতি, অসম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত অসমবাসীর উদ্দেশ্যে বলছেন যে, "ঘরের ছেলেদের বলুন কোন অসম্ভব স্বপ্ন না দেখতে"। না সম্ভব নয় এখন আর পৃথক অসম দেশ তৈরী করা। বরং ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকলেই লাভ বেশী অসমবাসীর। শিক্ষিত অসমবাসীরও এই প্রকারই ধারণা।

পূর্বকথা ঃ অসমে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই অশান্তির আশঙ্কা রয়ে গেছে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ থেকেই। ঐদিন জাতির উদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রির ভাষণে পণ্ডিত নেহরু বলেন "We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily can not share at present in the freedom that has come." এই অবধি যদিও ঠিক ছিল—এর পরের বক্তব্যতে ছিল আশ্বাসবাণী। যা সম্বল করে বছরের পর বছর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জেলার মানুষ কিছুদিন অন্তরই দেখছিলেন অচেনা প্রতিবেশী আর উপায়ই বা কি? পাশে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের চাকমারা, মায়ানমারের কিছু অধিবাসী, ভুটান, নেপাল থেকে প্রচুর অভিবাসী মানুষ বাসা খুঁজছেন এই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে। পণ্ডিত নেহরুর পরবর্তী বক্তব্য ছিল, "They are of us and will remain of us what ever may happen, and we shall be shares in their good and ill fortune alike."

সত্তরের দশকের মধ্যভাগে ১৯৭৬, ১৯৭৭-৭৮ এবং '৭৯-তে চার চারবার ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে। বহু মানুষের নাম ছিল তাতে। ভোটও দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু ১৯৭৯-এর পর থেকে বারবার অশান্তির আগুন জ্বলেছিল অসমে। এই সময়েই তৈরী হয় আলফা—যার কথা আগেই বলেছি। জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছিল অসমের রাজনীতিও। এই সময় অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা আসু পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমদিকে আসুর দাবী ছিল ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে যে সব উদ্বাস্তু এসেছেন অসমে তাঁদের সবাইকে ভারতের নানা প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু ১৯৮৩-র রক্তক্ষয়ী নির্বাচনে জিতে আসা হিতেশ্বর শইকিয়া যখন সরকার গঠন করলেন, তখন তাঁর বজ্রকঠিন শাসনে আসু সহ সব সংগঠিত ছাত্র ও যুব শক্তির নাভিশ্বাস ওঠে। দি আসাম ট্রিবিউন পত্রিকার এক গবেষণায় দেখা যায় যে রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র ৪০/৪১টি আসনে হিতেশ্বর পরাজিত হতে পারেন। শ্রীমতী গান্ধী যেমন ৭১/৭২ সালে সিদ্ধার্থ রায় সরকারকে সাহায্য করেছিলেন অসামাজিক কাজকর্ম দমনে তেমনই শইকিয়াও সাহায্য পেয়েছিলেন কেন্দ্রের। আসুর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আগে বলতেন—এখন আর মাঝে মাঝেও বলেননা যে তাঁদের বিক্ষোভ শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া মানুষদের অসমে বসতি করতে না দেওয়া—কিন্তু আসুর আন্দোলনের ফলে অনসমিয়া অনেকেই শঙ্কিত ছিলেন যে এই বুঝি 'অসম ছাড়' নোটিশ এল। শইকিয়ার প্রচেষ্টায় এই শ্রেণীর মানুষরা খুবই স্বস্তি পেয়েছিলেন। হিতেশ্বর বেশ কয়েক হাজার মানুষকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে অসমে ফেরত নিয়ে যান। ষাটের দশক এবং সত্তরের দশকেও ধাপে ধাপে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অসমে আন্দোলন হয়েছে। ওইসব আন্দোলনের ফলে বহু সম্পন্ন বাঙালি পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে অথবা ভারতের অন্য রাজ্যে। তখন অসমের উগ্রপন্থীরা যে আন্দোলন করতেন তাঁদেরমূল পরিচালন সংগঠন ছিল 'লোচিত সেনা'। আসুর সদর দপ্তরে ১৯৮৬ সালেও আমি দেখেছি লোচিত বড় ফুকনের বড় ছবি। এই লোচিত বড় ফুকন ছিলেন একজন যোদ্ধা যিনি মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই আন্দোলন থেকেই বোঝা যায় অসমিয়ারা সম্প্রদায়গতভাবে এক না হতে চেয়ে ভাষাগতভাবে এক হতে চাইছেন। 'আসু' তো ছাত্র সংগঠন। এরপর গঠিত হল 'অসম গণপরিষদ'। এটি রাজনৈতিক দল। পরবর্তীকালে ইন্দিরার মৃত্যুর পরে রাজীব গান্ধীর সরকার। ১৯৮৫ থেকে '৯০, এইসময় রাজীব গান্ধীর 'অসম চুক্তি' কংগ্রেসকে কিছুটা এগিয়ে এনেছিল আসামে। ফলে অ-গ-প থেকে পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদের জন্ম। আর আলফার জন্ম। যদিও আরও আগে কিন্তু তারা তাদের কাজকর্ম লাল অক্ষরে দেওয়ালে লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ফলে তখন স্থানীয় অসমীয়া প্রৌঢ়রাই বলতেন যে দেওয়ালে লিখে লিখে অসম স্বাধীন হবে? একটু ব্যঙ্গাত্মক ছিল তাঁদের মনোভাব। কিন্তু আলফাকে তার বর্তমান শক্তি দিয়ে দিলেন হিতেশ্বর শইকিয়াই।

আলফার জন্ম ঃ কিছু কিছু আলফা যুবক উগ্রপন্থা ছেড়ে দিয়ে ফিরতে থাকেন সাধারণ জীবনে। শইকিয়া সরকার তাদের দেন ১,০০,০০০ টাকার টোপ। অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ কর—তাহলে এক লক্ষ টাকা এবং আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। কিছু ছেলে গাড়ীও পেয়েছিল—মারুতি গাড়ী। পরিবহন ব্যবসা করবে বলে বা ট্যুরিজমের ব্যবসা করবে বলে। পরে দেখা গেল যারা টাকা পেয়েছিল—টাকা শেষ। যারা গাড়ী পেয়েছিল তাদের গাড়ী চড়ছে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এইভাবেই এল টাকা। সরকারী টাকা এল উগ্রপন্থায়। সহজভাবে টাকা রোজগার করার প্রবণতা এল। কিছুই না, গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান-জাতীয় কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই হল যে এই ব্যক্তি আলফার সঙ্গে যুক্ত। এখন ফিরতে চায়। ব্যস, ওইটুকু স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সে সরকারী সাহায্য পেতে পারত। এইভাবে জন্ম নিল 'সারেন্ডারড আলফা'। হিতেশ্বর কিন্তু সিদ্ধার্থ হতে পারলেন না। কংশাল দিয়ে নকশাল উচ্ছেদের মত আলফা দিয়ে আলফার উচ্ছেদে করানো গেল না। আর টাকার জন্য, আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, আলফা শুরু করল মুক্তিপণের টাকা চাওয়া। দুলিয়াথানে মারা গেলেন পেট্রোলিয়াম বিশেষজ্ঞ ডঃ রবি মিত্র। একজন রুশ বৈজ্ঞানিক মারা গেলেন, কয়েকটি চা কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মীদের বিনিময়ে পাওয়া গেল প্রচুর টাকা। অসমের দরিদ্র, নিরন্ন অধিবাসীদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে শুরু হয়েছিল যে আন্দোলন তার পরিণতির দিকে অগ্রগমন শুরু হল এইভাবে। তবে হিতেশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল আলফা দিয়ে আলফার উচ্ছেদ সেটা সফল হতে পারেনি শুধুমাত্র একজনের জন্য। তিনি হলেন 'পি বি স্যর'। পরেশ বড়ুয়া সর্বাধিনায়ক, আলফা জঙ্গীদের গোষ্ঠীর প্রধান। এই পরেশ সম্বন্ধে নাগা বিপ্লবীরাও বেশ শ্রদ্ধাশীল। সাধারণত নাগারা অসমীয়াদের লড়াকু জাত বলে স্বীকার করে না কিন্তু পি বি স্যর সম্বন্ধে এদেরও শ্রদ্ধা রয়েছে। আলফার সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে পরেশের দুজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইতিমধ্যেই গোষ্ঠীচ্যুত। হীরকজ্যোতি মহন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত এবং চক্র গোহাইন ওরফে লম্বু আত্মসমর্পণ করেছে। সম্প্রতি মাধুর্য্য গোহাইন নামে আরও এক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে হারিয়েছে পরেশ—এই সেই মাধুর্য্য যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর বিদেশী মারণাস্ত্র নিয়ে এসেছে আসামের অভ্যন্তরে।

বড়ুয়াই যে জঙ্গী গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ, একথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বুঝতে একটু সময় লেগেছে। অপারেশন বজরঙ্গ নামে আলফা বনাম সেনাবাহিনী যুদ্ধে একটুর জন্য পরেশ পালিয়ে যেতে পারে।

ফলে তারপর আবার আলফা গোষ্ঠী দানা বেঁধে উঠে অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে। যার আপাতত শেষ ধ্বংস কাণ্ড হচ্ছে আসামে একটি রেলস্টেশন এবং দুটি প্রশাসনিক ভবন পোড়ানো। বর্তমানে আলফা জঙ্গীদের দাপটে আসামে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ। জনজীবন বিপর্যস্ত। ডিব্রুগড় জেলার পানিটোলা স্টেশনে আগুন দিয়ে সহকারী স্টেশন মাস্টারের মৃত্যু।

কে এই পরেশ : ১৯৭৬-৭৭ সালেও স্কুলে পড়ত পরেশ। শ্যামল বরণ, লাজুক, পাতলা চেহারার পরেশকে দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারত না যে এই ছেলেটিই একসময় জায়গা করে নেবে ভারতের জাতীয় পত্রপত্রিকাগুলির মলাটে। স্কুলের হয়ে ফুটবল খেলে গেছে পরেশ গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় আর জোড়হাটে। পরবর্তীকালে লীগ খেলার জন্যও ও বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ফুটবল খেলার মাঠ আর ওর ভাল লাগেনি। ২১শে এপ্রিল ১৯৭৯ সালে রংঘরে বসে অসমকে মুক্ত করার শপথই পাল্টে দিয়েছে ওকে। তবে প্রায় দু'দশক ধরে খুন, অপহরণ আর ভয় দেখিয়ে টাকা রোজগার করে করে পরেশ হারিয়ে ফেলেছে অসমের শিক্ষিত মানুষের সমর্থন। অসম এবং ভারতের বেশিরভাগ ওয়াকিবহাল মানুষই মনে করে পরেশ একজন নৃশংস বিদ্রোহী নায়ক। যার মানুষ খুন করতেও হাত কাঁপে না। পরেশেরই কাছের এক গেরিলা কম্যান্ডার ধরা পড়ার পর সেনাবাহিনীর কাছে তার একদা গুরু সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে "পরেশ স্যার হ্যাজ ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড। হি ক্যান নট অলওয়েজ ওয়ে দি পলিটিক্যাল প্রজ এ্যান্ড কন্স অফ এ ডিসিশন। বাট দেয়ার ইজ নো ডিনাইয়িং হি ইজ এ বর্ন সোলজার"।

জন্মসৈনিক পরেশ কিন্তু আজও স্বপ্ন দেখাচ্ছে মুক্ত স্বাধীন অহম রাজ্যের। যা কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক— কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমনকি একটু চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে ভৌগোলিকভাবেও অসমকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভাবা কঠিন। উজানী আসামের এক প্রথিতযশা কবির ভাষায় "ও আসামের যুবশক্তির ফুল ঝরাচ্ছে— কোথায় ও আমাদের নিয়ে যেতে চায় তা ও নিজেই জানে না।"

প্রায় একই মতামত দিয়েছেন অধুনা কলকাতা নিবাসী এবং দীর্ঘদিন অসমবাসী বৈজ্ঞানিক শ্রী শচী বসু।

১৯৮৬ সালের অসম অ্যাকর্ডের পর জেড এ ফিজোর নাগা ন্যাশানাল কাউন্সিল এবং লালডেঙ্গার মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট শেষ অবধি তাদের আক্রমণের তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। ওইসব মাওবাদী জঙ্গী নেতারা অনেক বিলম্বে উপলব্ধি করেন, মহাত্মা গান্ধীর অমর বাণী Eye for an eye will make the world blind. কিন্তু বড়ুয়া ওসব বোঝেন না। ওর বক্তব্য "আই হ্যাভ ড্রেম্‌ট ফর অসম্‌স্‌ ফ্রীডম। আই ক্যান নট স্লীপ টিল ইট ইজ এ্যাচিভ্‌ড্‌, অল এলস—আই উইল ডাই ফর ইট"।

পরেশের প্রভাব অসমে এতটাই যে ১৯৯২ সালে নরসিমা রাওয়ের আহ্বানে যখন অরবিন্দ রাজখোয়া, প্রদীপ গগোই বা অনুপ চেটিয়ারা দিল্লী গিয়েও বিমানবন্দর থেকেই ফিরে চলে আসে পরেশের ডাকে। আলোচনা সংঘটিত হয় না। ১৯৯৬ সালে প্রফুল্ল মহন্ত দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পরও পরেশ রাজী নয় দিল্লীর সঙ্গে আলোচনায়। ও বিবিসি-কে বলেছে "I'll negotiate from tomorrow like Nagas if I get freedom through negotiation."

সঞ্জয় ঘোষের অপহরণ : মাজুলি উজান অসমের একটি ব-দ্বীপ। এটি নাকি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি নদী ব-দ্বীপ। দুপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রের জল প্রতিবছরই ভাসিয়ে নিয়ে যেত মাজুলির ঘরবাড়ী, গবাদি পশু। সঞ্জয় ঘোষের অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারী এজেন্সিজ ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নর্থ ইস্ট) বা এভার্ড (এনই) সঙ্গীরা এই মাজুলিতে একটি হেলথ সেন্টার, একটি লাইব্রেরী চালু করেছিলেন। সঞ্জয়ের কথামত স্থানীয় লোকেরা নদীর ধারে ধারে বনসৃজন করেন। তৈরি করেন মাটি আর পাথর দিয়ে বাঁধ। ফলে এইবছর ভরা বর্ষাতেও মাজুলি সেভাবে ভাসেনি। আর এইখানেই বিপদ আসে আলফার কাছ থেকে। গত ১৯৯৬-এর এপ্রিলে স্থানীয় দুটি ছেলে এসে প্রথম বলে যে এ্যাভার্ড আসলে 'র'-এর চর। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW যাবতীয় সংবাদ পায় এ্যাভার্ডের কাছ থেকে। এতে কিন্তু কান দেননি সঞ্জয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুপুত্র—দূরদর্শনের ডিরেক্টর জেনারেল ভাস্কর ঘোষের ভ্রাতুস্পুত্র, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি অরুন্ধতী ঘোষ যাঁর পিসি—সেই সঞ্জয় ছিলেন অকুতোভয়। অসম পুলিশ তাঁর নিরাপত্তার জন্য রক্ষী দেবার কথাও বলে, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেন সঞ্জয়। বলেন, স্থানীয় মানুষের সাথে, তাঁদের জন্য এবং তাঁদেরই কাজ করছি। বিপদ হলে ওঁরাই রক্ষা করবেন। কিন্তু না গত ৪ঠা জুলাই জোড়হাট জেলার মেখলিবাড়ীতে একটি মুরগীর পোলট্রি দেখতে যাবার সময় আলফা তাঁকে অপহরণ করে। সঞ্জয়ের সঙ্গী চন্দন ফিরে আসেন ৬ই জুলাই। তিনি নাকি নদী সাঁতরে পালিয়ে আসেন। যদিও ভরা বর্ষায় ওই নদী পারাপার দুঃসাধ্য। ৯ এবং ১০ বছরের দুই সন্তান নিয়ে সঞ্জয়ের স্ত্রী সুমিতা পথ চেয়ে দিন কাটাতে থাকেন। এরপর আলফা ফ্যাক্স করে জানায় যে মাজুলি ছেড়ে এ্যাভার্ড এনই-কে চলে যেতে হবে। তবে তারা সঞ্জয়কে ছাড়বে। সেই মত কাজও হয়।

ইতিমধ্যে আলফার সেকেন্ড ইন কমান্ড রাজ বরুয়ার ওদেরই সংগঠনের প্রচারসচিব মিচিঙ্গা দইমারীকে পাঠানো একটি বেতার বার্তা সেনাবাহিনী ট্যাপ করে জানতে পারে যে অরুণাচল প্রদেশের এক পাহাড় থেকে পড়ে সঞ্জয় ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। এর পরপরই মিচিঙ্গা একটি ফ্যাক্স বার্তায় সঞ্জয় ঘোষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানায়। বলে যে সেনাবাহিনীর তাড়ায় ওদের দলের কর্মী অপূর্ব গোস্বামী মারা যান। তিনিই সঞ্জয়ের মুক্তির ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এরপর সঞ্জয়কে তাড়াহুড়ো করে সমতলে আনার সময় পা পিছলে তিনি গভীর খাদে পড়ে যান। যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধারও করা যাবে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অভিযোগ অস্বীকার করে। ওদের বক্তব্য ১৯৯১ সালে রুশ প্রযুক্তিবিদ সেরগেই গ্রেচেস্কোর মৃত্যুর পরেও আলফা অনুরূপ কথা বলে। পরে দেখা যায় যে কোনো সেনা অভিযানই হয়নি। সঞ্জয় ঘোষের মৃত্যুকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন।

নির্বাক দুই সরকার : ৪ঠা জুলাই '৯৭ সঞ্জয় অপহৃত হবার পর ৩১শে জুলাই '৯৭ প্রফুল্ল মহন্ত প্রথম মুখ খুললেন। এতদিন কোনো শব্দও উচ্চারণ করেননি। কেন্দ্রীয় সরকারও নির্বাক ছিলেন। গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য রাখছিলেন। সঞ্জয়কে যে ৪ঠা আগস্টই মেরে তার মৃতদেহ পাহাড়ের খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে—এই কথা বলছেন সেনাবাহিনী। তাঁদের ধরে ফেলা আলফার রেডিও বার্তায় নাকি এই তথ্যই পাওয়া গেছে।

গত ১৪ই আগস্ট '৯৭ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ডিব্রুগড়ের পানিটোলা স্টেশনে আগুন জ্বালিয়ে এবং টেঙামাঠের বিডিও অফিস জ্বালিয়ে দিয়ে আলফা জঙ্গীরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে বাধা সৃষ্টি করে। এখনও দুই সরকারই নির্বাক। স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গী করে চিরুণী তল্লাসী চালিয়ে উগ্রপন্থীদের খুঁজে বার করে তাদের বিচার করা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় জনসাধারণ। ইতিমধ্যেই আলফা তার জনসমর্থন হারাচ্ছে। সঞ্জয় ঘোষের ব্রোঞ্জ মূর্তি বসছে মাজুলিতে। এরপরও যদি আলফাকে তার কাজ চালাতে দেওয়া হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতাই প্রকট হবে।

ছাগল

বিজনকুমার ঘোষ

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে আছে বাসে একবার একটা লোক মই নিয়ে ওঠে, তাতে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যায়। মই নিয়ে হৈ-চৈ হবারই কথা। কারণ ঘটনাস্থল কলকাতা। মফস্বলে কিছুই হয় না। সব কিছুই ওখানে চোখ সহ্য। কী না ওঠে বাসে! কলকাতার কন্ডাকটাররা তবু প্রতিবাদ করে। অনেক সময় পয়সা বেশি দিলেও রাজি হয় না। কিন্তু মফস্বলের কন্ডাকটারদের হাত সর্বদা বরাভয়ের স্টাইলে।

অফিসের কাজে আমাকে একবার বাসে আরামবাগ যেতে হয়েছিল। এসপ্ল্যানেড থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সরকারি বাস। আমি গেলাম টিকিটও শেষ। আর এক ঘন্টা অপেক্ষা মানে ভয়ানক লেট। আমার হতাশ মুখ দেখে টাউট গোছের একটি লোক এগিয়ে আসে, আরামবাগ যাবেন স্যার? আসুন, এক্ষুনি ছাড়বে। ভাড়া ওই সতেরো টাকাই। জানালার পাশে বসে পড়ুন চটপট।

অর্থাৎ আমি যা চাইছি সব কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল। এটি প্রাইভেট বাস। দূরপাল্লার বলে গদি টদি প্রায় সরকারি বাসের মতোই। বাস চলছে। একটু যেন ঘুমও পাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠি প্রচণ্ড দুর্গন্ধে। কেউ বমি বা অন্য কিছু করল নাকি? সবারই ফ্যাল ফ্যাল অবস্থা। পাক্কা পাঁচ মিনিট লাগল রহস্য ভেদ করতে। ড্রাইভারের ঠিক পেছনেই একটি শুঁটকি মাছের বস্তা। উভয়ের গন্ধে গোটা বাস তাই আমোদিত। কাছাকাছি একটি মেয়ে বমিও করে ফেলে।

—কার ওটা? শিগগির হঠাও।

কেউ উত্তর দেয় না। শুঁটকির মালিক ঘাপটি মেরে থাকে।

এবার ডাম্বেল ভাজা বাবরি চুলো এক যুবক উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াও, আমি এখনই লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছি—

—ওটি করবেন না স্যার—এতক্ষণে কন্ডাকটারের হুঁশ হয়ঃ গরিব মানুষ, মারা পড়বে।

—এদিকে আমরা যে মারা পড়ছি।

—এই মশাটে নেমে যাবে স্যার। আর আধ ঘন্টা।

সওয়া ঘন্টা পর মশাট। মালিকের দেখা পেতে সবাই উশখুশ করে। আমারই পাশের সিটের ছোকরাটি মুচকি হেসে বস্তা নিয়ে চলে যায়। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

উঁহু, বাঁচা কি অতই সস্তা? চাঁপাডাঙ্গা আসতেই ঘোর বিপদ। এবার বাসের মধ্যে একটা ছাগল। আমরা যথারীতি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কন্ডাক্টর নির্বিকার। মালিককে কিন্তু সহজেই শনাক্ত করা গেল। শক্ত চেহারা। পাতলা চুল। বঁড়শির মতো নাক। কাঁচাপাকা চুল। এই ধরনের মানুষরা খুব ধার্মিক হয়। চড়া সুরে বলি, ছাগল যাবে না। নেমে যান।

—আলবৎ যাবে। আপনিই নেমে যান।

—বলি বাসটা মানুষের না ছাগলের?

—জীবের। আমরা সবাই কেষ্টর জীব।

—তবে রে—ডাম্বেল ভাঁজা যুবকটি হঠাৎ হুঙ্কার দেয়ঃ ছাগলের কান ধরে নামিয়ে না দিই তো।

—উঁহু, ছাগলের কান বড় ডেলিকেট, এই কর্মটি করবেন না।

—অ্যাই কন্ডাকটার, এসব কী হচ্ছে। বাপের জন্মে শুনিনি বাসে ছাগল। নামবে কি না শুনতে চাই।

—আহা, রাগ করেন কেন—কন্ডাক্টরের বিগলিত মার্কা হাসি ঃ ছাগল বলে কি মানুষ না?

—দেখুন মশাই, আমি আরামবাগে নামব, ছাগলও সেখানে। এটাই শেষ কথা।

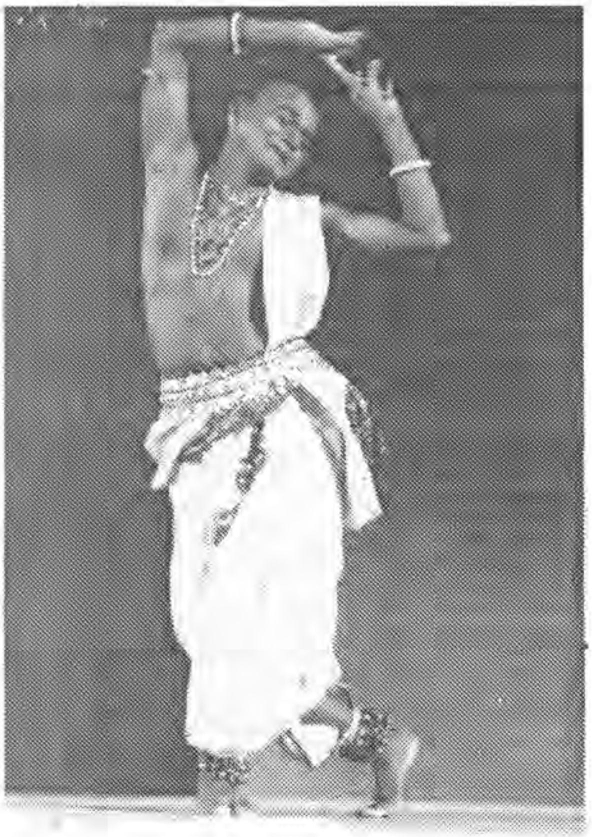
—এতো মগের মুল্লুক মশাই।

—মোটেই নয়। আমার ছাগল রীতিমতো টিকিট কেটেছে। দেখতে চান? বাসের মধ্যে আপনারও যে দাম ছাগলেরও সেই দাম।

এ যে উকিলি সওয়াল। ডাম্বেল ভাঁজা দমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। মনে পড়ে কলকাতায় এখন রমরম করে চলছে, মানিক মণ্ডলের 'মানুষের চেয়ে ছাগল দামী'। অনেকেই দাঁড়িয়ে, তবু এর মধ্যেই সিট জোগাড় করে ফেলেছে বাহাদুর ছাগল। খুবই স্মার্ট। হবেই তো, লম্বকর্ণের বংশধর যে। কয়েকটি নমুনা। খড় বোঝাই লরি যাচ্ছিল কাছ ঘেঁষে। মুখ বাড়িয়ে এক খাবলা জলযোগ সেরে এক ভদ্রলোকের সাইড পকেট থেকে দরকারি কাগজপত্তর টেনে বার করে ফেলে। মনোযোগ দিয়ে যিনি খবরের কাগজটা পড়ছিলেন তার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে লাগল। এদিকে ডাম্বেল ভাঁজা নেমে যেতে আমরা আরও অসহায়। নতুন স্ত্রীদের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই মজাদার। স্কুলের বাচ্চা মেয়েটি টিফিন কৌটো খুলে কলাটি দিতেই দিব্যি খেয়ে নেয়। ইতিমধ্যে সিট ভিজিয়ে দিলে পাশের লোকটির অবস্থা হয় শোচনীয়। কলা খেয়ে মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয়েছে। ফলে ওর ইউনিফর্মের একটা টুকরো ভ্যানিশ। আর তিন তিনটি মহিলার খোঁপার ফুল।

বালক বয়সে 'লম্বকর্ণ' পড়ে প্রচুর পরিমাণে হেসেও মেনে হয়েছে পরশুরাম বুঝি একটু বেশি স্বাধীনতা নিয়ে ফেলেছেন। পাঁঠা কি নব্বই টাকার নোট, ঢোলের চামড়া, ব্যায়লার পাত, হারমোনিয়াম চাবি, মায় স্টিলের কঙ্কাল চিবিয়ে খেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে ঠিকই লিখেছেন পরশুরাম। ওরা সব পারে। বাসের মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকা। শিশুদের মুখে হাসি উবে গিয়ে 'বাবারে', 'মারে' চিৎকার। কান্না থামতে চায় না। মায়েদের উদ্বেগ। মোড়ের কাছে লাফ দিয়ে ট্রাফিক পুলিশ উঠে পড়ে। আজকাল বাসেও ডাকাতরা যাত্রী সেজে ঘাপটি মেরে থাকে। ডাকাতের বদলে নধরকান্তি ছাগল দেখে মুচকি হেসে চলে যায়। ছাগল টিকিট কেটেছে যেন মাথা কিনে নিয়েছে, বলা মাত্র পেছনে রাম টুঁ। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করেন। ছাগল বাংলা ভাষাটা ভালই বোঝে। এখন বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। বাসের বেগ কমছে। এসে গেল আরামবাগ। নিজের পাড়ায় মস্তানি বাড়বে বই কমবে না। আমরা ত্রস্ত নেমে যাই। খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি প্রভুভক্ত ছাগল অনেক দূর থেকে কোঁচার খুঁট মুখে নিয়ে প্রাণপণে টানাটানি করছে। তর্কবাগীশ মশাই ঘুমিয়ে কাদা। ছাগল ঘুম না ভাঙালে নির্ঘাৎ ওভার ক্যারেড হয়ে যেতেন।

কলকাতায় কেলুচরণ



উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র প্রতিষ্ঠিত ওডিসি নাচের কেন্দ্রটির নাম হল 'সৃজন'। অধুনা এই প্রতিষ্ঠানের একটা শাখা কেন্দ্র খোলা হল দক্ষিণ কলকাতার রাণিকুঠিতে। সামগ্রিক পরিচালনায় আছেন গুরু কেলুচরণের কৃতী ছাত্র কুন্দন মুখোপাধ্যায়। প্রতি তিন মাসে একবার করে শ্রী মহাপাত্র নিজে এসে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কলকাতায় যে ওডিসি নাচের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে তা বোঝা গেল এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই। এক মাসের মধ্যেই শিক্ষার্থী সংখ্যা এখানে পঞ্চাশের অধিক। কর্ণধার কুন্দন মুখোপাধ্যায় বললেন, 'গুরুজির বহুদিনের ইচ্ছে ছিল সৃজনের একটি শাখাকেন্দ্র চালু করার। কারণ এই শহর ওডিসি নাচের অন্যতম পীঠস্থান। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়ে আমরা ধন্য। শ্রী মহাপাত্র ছাড়াও রতিকান্ত মহাপাত্র ও সুজাতা মহান্তিও নিয়মিতভাবে এখানে এসে প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। ইতিমধ্যেই দুখানি বড় মাপের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। যেখানে পাঠ নিয়ে গেছেন ডোনা রায়, পৌষালি মুখোপাধ্যায়, সুতপা তালুকদার প্রমুখ কলকাতার তাবড় ওডিসি নৃত্য শিল্পীরা।

এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি উল্লেখ্য দিক হল দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুলভে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা। যারা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য উপায়ে গুরু শ্রী মহাপাত্রের কাছে তালিম নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন না, তাঁদের জন্য এখানে অত্যন্ত অল্প খরচে পাঠ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এমন কি দূর দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীদের থাকারও বন্দোবস্ত রেখেছেন কর্তৃপক্ষ।

❑ সংবাদদাতা

প্রতিবন্ধীদের স্বাধীনতা উৎসব

বিভিন্ন প্রতিবন্ধী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উৎসবটি যথোচিত মর্যাদায় পালন করল বেহালার "অ্যাহেড" বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। মেঘ রোদের আলোছায়ায় সকালটি সত্যিই উপভোগ্য হয়ে ওঠে তাদের আনাড়ি মুন্সিয়ানায়। যোগদানকারীদের প্রত্যেকই কেউ দর্শনে, কেউ শ্রবণে বা কেউ মেধায় প্রতিবন্ধী। কিন্তু মনের জোর আর আন্তরিকতায় যে প্রতিবন্ধকতা অনেকটাই পূরণ করা যায় তা প্রমাণ করে গেল এই নবীন দল। যেমন 'বিস্তীর্ণ দুপারের' গানের সঙ্গে আলপনা বিশ্বাসের নৃত্যায়ম বা

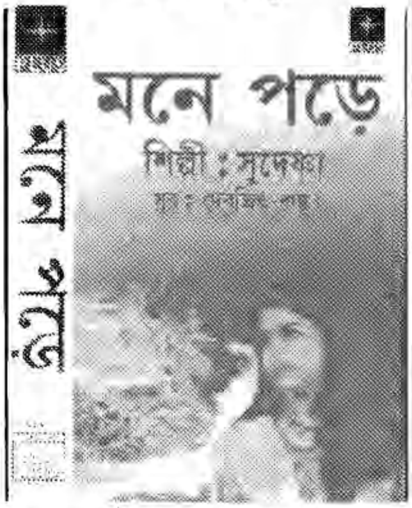


সূর্যশেখর বসুর রবীন্দ্র সঙ্গীত (যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক) অবলম্বনে নৃত্য এক কথায় অসাধারণ। তপতী, সুমিত্রা, ডলি, কুমকুমের সম্মিলিত প্রয়াসে রত্না বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আমার দেশ আমার স্বপ্ন' দর্শকমন জয় করে। তেমনই ভাল লাগে অনামিকা সিন্হার পরিচালনায় অমিতাভ, অমিত, বুন, নার্গিস, পায়েল, গুড়িয়া, সোনা, তনু, গৌতম, পিকু-র অভিনীত দৃশ্যায়ন 'জঙ্গ ল মে মঙ্গল'। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সুষ্ঠ উপাস্থাপনায় অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস সফল হয়েছে। তাঁর ছন্দোবদ্ধ উপস্থাপনায় কার্যক্রম সাবলীলভাবে এগিয়ে যায়। পাশাপাশি ডঃ অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিমিত গ্রন্থনাও বিশেষ উল্লেখ্য। নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীপ্তি চক্রবর্তীর পরিচালনায় সংগীতালেখ্যও সমান সুন্দর। এখানে অংশগ্রহণকারী স্কুল গুলি ছিল 'ওপেন হার্ট অ্যাহেড ও 'ব্লাইন্ড স্কুল'।

❑ অরূপ ভট্টাচার্য

ক্যাসেট

মনেপড়ে



আমি বাঙালি যখন নতুন গান শুনতে নেহাত অনিচ্ছুক, শুধু পুরনো গানে অতীতে স্মৃতি চারণে সুখী ঠিক সেই সময় প্লাস মিউজিক একরাশ নবীন প্রতিভাদের নতুন গান গাইবার যে সুযোগ করে দিচ্ছে সেকাজ সত্যিই দুঃসাহসিক। তার জন্য সাধুবাদ পাবেন প্লাস মিউজিক, কলকাতা শাখার কর্ণধার অভিজিত মিত্র। সম্প্রতি শ্রী মিত্রের তত্ত্বাবধানে যে ক্যাসেট প্রকাশিত হল তার নাম 'মনে পড়ে'। ক্যাসেটের আটখানি গান গেয়েছেন সুদেষ্ণা। সুদেষ্ণার গায়কী অনবদ্য। তার মধ্যে কোনও ফাঁকি যেমন নেই, তেমন নেই অনুকরণ করার প্রবণতা। গানগুলি লিখেছেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ সিংহ ও শ্যামল সেনগুপ্ত। সুর দিয়েছেন দেবজিৎ শম্ভু। বাপী উকিলের সংগীতায়োজন যথাযথ। শিবনাথের লেখা 'দোলে দোলে ওই দোলন চাঁপা। গানটি অসাধারণ। তিনি চলতি ঢঙের বাইরে চলার চেষ্টা করেন, তার ছাপ এখানে সুস্পষ্ট। এছাড়া শ্যামল সেনগুপ্তের 'আজকাল দিন রাত রাতদিন' এবং তরুণ সিংহের 'তোমার মতো এমন করে' গানগুলি দেবজিৎ শম্ভুর সুর সংযোজনায় সুন্দর মাত্রা পেয়েছে।

মনে পড়ে সুদেষ্ণা
প্লাস মিউজিক
দাম ঃ ৩০ টাকা

কে ডাকে বাঁশিতে



অনসুয়া ঘোষ তেমনই একজন বাঙালি শিল্পী যিনি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিতে। তাঁর দীর্ঘ শরীরী অসুস্থতা কাটিয়ে যে আবার ফিরে এসেছেন সুরের জগতে সেটা সুখবর নিঃসন্দেহে। আটলান্টিস মিউজিক থেকে প্রকাশিত বাংলা গানের ক্যাসেট 'কে ডাকে বাঁশিতে' তাঁর প্রতিভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অর্ধেক পুরনো ও অর্ধেক নতুন গান নিয়ে ক্যাসেটটি তৈরি। 'পাগল হাওয়া', 'প্রখর দহন অতি' বা 'ভুল সবই ভুল' গানগুলি শিল্পীর গলায় যথার্থতা লাভ করেছে। নতুন গানের মধ্যে 'রাতের আকাশ' বা 'কে ডাকে বাঁশিতে' শুনতে ভালই লাগে।

অনুসূয়া ঘোষ
আটলান্টিস মিউজিক
দাম ঃ ৩০ টাকা

মুক্তিপ্রতীক্ষিত ধারাবাহিক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতা

দূরদর্শনের যে সব বাংলা ধারাবাহিক মুক্তি প্রতীক্ষায় সেগুলোর মধ্যে আছে তপন সিংহ'র **'হুতোমের নকশা'**। সম্ভবত এটি **শুরু হবে ৯ অক্টোবর থেকে। 'চেতনা'** ধারাবাহিকের জায়গায়।

'ঘুম নেই' এর জায়গায় ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে পারে **'সূর্যস্নান'**।

'আলোয়ার আলো'-র পর ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে আসতে পারে **'আলালের ঘরের দুলাল'**। **'রিপোর্টার এক্স'** সম্ভবত মুক্তি পাবে **'নীলঘূর্ণী'** ধারাবাহিকটির পর।

নাটক

আননের 'উদ্ভাসিত পঁচিশে' মানুষের জয়গান

পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপথিয়েটারের মধ্যে বীরভূম জেলার 'আনন' একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী নাম। শুধু সমকালীন নাট্য প্রযোজনাই নয়, বিগত পঁচিশ বছর ধরে নানান সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে, নিয়মিতভাবে এবং একটি তথ্যভিত্তিক নাট্য পত্রিকা 'আননায়ুধ' প্রকাশনার ক্ষেত্রেও গোষ্ঠীটি বারবার তাদের দায়বদ্ধতার নজির রেখেছে।

'আনন' তার রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বছর ধরে, জেলা শহর সিউড়ীতে বেশ কিছু নাট্যানুষ্ঠান করে পরে, শিশির মঞ্চে তাদের 'উদ্ভাসিত ২৫ বছরের' স্মারক সংকলনটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে এবং শেষে দলের চলতি প্রযোজনা ও নাট্য একাদেমির বিশেষ পুরস্কার পাওয়া নাটক 'মহাজ্ঞানী' পরিবেশন করে।

এ নাটকের কাহিনী দেশের লোককথা 'জ্যোতিষী স্বয়ং' অবলম্বনে রচিত। নাটকটির মূল রচয়িতা চাং শোউ চেন যার বাংলা নাট্যরূপ দেন দুলাল কর। 'মহাজ্ঞানী' নাটকটির গানের কথা, সংযোজনা, সম্পাদনা ও নির্দেশনার কাজটি নিখুঁতভাবে করেন বাবুন চক্রবর্তী।

নাটকটির ঘটনা ক্রমে রয়েছে—কোন এক গ্রামে, গরিব চাষি ধনা ওরফে ধনঞ্জয় কার্যকারণ সম্পর্ক দেখে বৃষ্টির আগাম খবর, হারানো গরু অথবা কানের দুল খুঁজে দিতে পারে। ফলে 'ধনা' নিজেকে গুণীন না ভাবলেও গ্রামের লোকে তাকে মস্ত গুণীনই ভাবে। সেখানে অন্যান্য ভন্ড জ্যোতিষ বা গুণীনের সাথে ধনার অজান্তে রেষারেষি শুরু হয়। ঘটনা চক্রে রাজার গজমুক্তহার খুঁজে বের করার জন্য ধনাকে রাজপ্রসাদে ধরে আনা হয়। এবং বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ ধনঞ্জয় নিজেও জানতে পারেনা তথ্য ও সত্য থেকে প্রকাশ পায় অপকর্মটি স্বয়ং রাজমন্ত্রীর। কিন্তু মন্ত্রীর কারসাজিতে নাটকের মোড় ঘোরে এবং দোষী সাজানো হয় এক নির্দোষ চোর কে। কিন্তু ধনার উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির ও পরম সত্যের। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী 'ঘরের শত্রু বিভীষণের' চরিত্রের পর্দা ফাঁস হয়। 'সবার উপর মানুষ সত্য,

শেষাংশ সাঁইত্রিশ পাতায়

৪২এর বিপ্লব ঃ এক অসাধারণ প্রযোজনা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। যে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভারতবাসী সেদিন সংগ্রাম করেছিলো, সে স্বাধীনতা আমরা কি পেয়েছি এখনও ? ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুষ্টিমেয় কালোবাজারী মুনাফাবাজরা বর্তমানে ইংরেজদেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ কাহিনী সেই অতীত দিনের বিপ্লবীদের পটভূমিতেই তৈরি। যে কাহিনী আজও শোনায় তারুণ্যের ইতিহাস। দালাল জমিদারের ছেলে মহেন্দ্রনারায়ণ এই কাহিনীর নায়ক। একদিকে সে জমিদারদের যোগ্য সন্তান ইংরেজদের দালাল আবার অন্যদিকে সে নির্যাতিত মানুষের বন্ধু প্রশান্ত রায়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের একমাত্র ছেলে স্বপনকে উৎসর্গ করতে যার এতটুকু বাধেনি। যোগ্য সহধর্মিনী কমললতা বিপ্লবী স্বামীর কাজের সহযোদ্ধা। কিন্তু সে জানেনা যে বিপ্লবী প্রশান্ত রায় তার স্বামী। দালাল মহেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বলে সে লজ্জিত, ব্যথিত হয়ে সংসার ছেড়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সে চিনতে পারে তার স্বামীকে এবং রণক্ষেত্রে যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে আত্মাহুতি দেয় বিপ্লবের আগুনে।

দ্বিতীয় প্রযোজনা 'কুরুক্ষেত্রের আগে'। শাল্বদেশে অত্যাচারী রাজা হংস আর তার অন্ধ অনুসরণকারী ভাই ডিম্বক যখন সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ আর ধর্মের উপর



অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল ধার্মিক পিতা সোমদত্তকে করল রাজ্যচ্যুত, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে তার উপর চালাল নৃশংস অত্যাচার, তখন সনাতন ভারতের ধার্মিক মানুষেরা করল প্রমাদ, কিন্তু শিবের বর প্রাপ্ত অক্ষয়গুণের অধিকারী হংস-ডিম্বককে ধ্বংস করার কেউ ছিল না। কিন্তু যুগে যুগে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ধরনীকে ভারমুক্ত করার জন্য, যিনি এই পৃথিবীতে আসেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এলেন সমস্যার সমাধানে। দুর্বাসাকে করাঘাত করার প্রতিশোধ তিনি নিলেন হংস-ডিম্বকের রক্তে। "ধরায় ধর্মের রাজ্য হল স্থাপন"।

সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর মজিলপুরের অগ্রণী নাট্যসংস্থা অভিনেতৃ সংসদ প্রযোজিত,

নাটক দুটির সম্পাদনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন প্রবীন নাট্যকর্মী অরবিন্দ মিত্র ও তাঁকে সাহায্য করেন সংস্থার প্রাণপুরুষ, সহনির্দেশক ও অভিনেতা ডাঃ রাম প্রসাদ মন্ডল।

রামবাবু দুটি পালাতেই দালাল মহেন্দ্র ও বিপ্লবী প্রশান্ত রায়ের চরিত্র যেমন অসীম দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত মহান চরিত্রকে করেছেন প্রাণবন্ত। অপেশাদার একজন নাট্যকর্মী, পেশায় চিকিৎসক ও সমাজসেবী একজন মানুষের কাছে এধরণের অভিনয় সত্যিই এক বিরল প্রাপ্তি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী ও প্রথিতযশা নট রঞ্জনকুমার। তাঁর সৃষ্ট হংসধ্বজ ও হারু ঘোষাল ভোলার নয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী অঞ্জনা ব্যানার্জী, চন্দ্রানী হালদার ও পূজা সেনগুপ্তার অভিনয় দেখার মত।

অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা দর্শকের বাহবা কুড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন, সুবীর ব্যানার্জী, প্রশান্ত সরকার, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শংকর দেবনাথ, দীপক মুখার্জী, ভাস্কর ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ সরকার, অমর ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস,

❑ প্রবীর চক্রবর্তী

ছত্রিশ পাতার শেষাংশ

গুণীন জ্যোতিষী নয়' এই সত্য প্রমাণিত হয়।

'আনন' গোষ্ঠী, মঞ্চে উপস্থাপনায়, প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকের মনকে এক অভিনব মাত্রা যোগ করে। সূত্রধার ১, গ্রামবাসী-বিলাস, অন্ধগায়কের চরিত্রে উত্তম চট্টোপাধ্যায়, সূত্রধার ২, গ্রামের অনন্ত গুণীন এর ভূমিকায় এবং নাটকটির পরিচালনায় বাবুন চক্রবর্তী তাদের প্রতিভাকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একই সাথে মন্ত্রী প্রদীপ রুজ এবং চোর—উজ্জ্বল হক। অল্প সময়ে অভিনয় প্রতিভা প্রকাশে সক্ষম। মাধব— অমিত মজুমদার এবং ধনা— স্বপন রায়, রাজা— সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন, তবে বৌ এর ভূমিকায় বহ্নি চক্রবর্তীর অভিনয় সপ্রতিভ ও আন্তরিক এবং সম্ভাবনাপুর্ণ। একই সাথে প্রহরী মদ্যপ চরিত্রগুলি দুর্বলতা উল্লেখ্য। ছোট খাটো দু-একটা ভুল ছাড়া টোটাল টীম ওয়ার্কটি যথেষ্ট টানটান।

❑ অঙ্গনা বর্মন

'হুতমের নকশা' ১৭ সেপ্টেম্বর দেখানো হবে?

তপন সিংহ'র অভিনব সৃষ্টি



'হুতমের নকশা'-য় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সোনাই রায়। ছবি ঃ এস রায়

আশিসতরু মুখোপাধ্যায় : ছোট পর্দার জন্য এই প্রথম ধারাবাহিক পরিচালনা করলেন বড় মাপের পরিচালক তপন সিংহ তাঁর 'হুতমের নকশা'-য়। এর আগে অবশ্য তিনি দূরদর্শনের জন্য টেলিফিল্ম করেছেন 'মানুষ', 'আদমি আউর আওরৎ' আর 'দিদি'।

কিছুদিন আগে প্রযোজক রামলাল নন্দী 'হুতমের নকশা' সাংবাদিকদের দেখাবার ব্যবস্থা করেন পিয়ারলেস ইন-এ তপন সিংহ'র উপস্থিতিতেই। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ছোট পর্দায় এমন অভিনয় ধারাবাহিক এর আগে হয়েছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই অভিনবত্বের কারণ, বিষয়বস্তু। এত সহজ করে একালের মানুষের চেহারাটা পরিচালক ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ আর কৌতুকের মধ্যে যেভাবে ফুটিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য।

পরিচালনা ছাড়াও এটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন পরিচালক স্বয়ং। রহস্যের মোড়কে নির্মল, অনাবিল এই হাসির ধারাবাহিকের নানা পর্বে আছে 'মালপো রহস্য', 'ভাগ্নে ও আংটি রহস্য', 'বধূ রহস্য', 'সিঁদের চোর', 'দিদিমা রহস্য', 'কলম রহস্য', 'ঘড়ি ও অঙ্কের খাতা', 'পটল রহস্য', 'রহস্যজয়ী পিসিমা', 'ট্যাক্সি রহস্য' এবং 'রহস্যের শেষ' কাহিনীগুলি।

কাহিনীর মূল পটভূমি মধ্যবিত্তের একটি পাড়া। তার খানিকটা জুড়ে রয়েছে বস্তি। ওই বস্তিবাসী আর মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা মধুর সম্পর্ক। পাড়ার রাজনীতিক দলের মস্তানদের হামলা নেই। সেই সঙ্গে ঠাঁই হয়নি চোর-গুণ্ডাদের। বাঙালিদের সঙ্গে কিছু অবাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষেরাও থাকেন ওখানে। তাঁরা তিনপুরুষ ধরে বাঙালি সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। ওই পাড়ার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে পরোপকার। একজনের জন্য আর একজন সহায়তা করেন। অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। হাত বাড়িয়ে দেন।

এই ধারাবাহিকের নায়ক বার-তের বছরের একটি বস্তির ছেলে। তার নাম হুতম। প্রখর বুদ্ধি তার। হুতমের বিস্ময়কর প্রতিভা দেখে নিজের কাছে রেখে মানুষ করছেন অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশ অফিসার কর্মবীর মজুমদার। এই দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমান সোনাই রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

তেরটি পর্বের মধ্যে সেদিন দেখানো হয় 'পটল রহস্য', 'সিঁধেল চোর', 'কলম রহস্য' আর 'ঘড়ি ও অঙ্কের খাতা রহস্য'। এই চারটি পর্বের কাহিনী দানা বেঁধেছে কোন না কোন চুরিকে কেন্দ্র করে। এবং সে-সব কিনারা করতে কর্মবীর এগিয়ে এলেও রহস্যের সমাধান করেছেন ওই কিশোর হুতম। তার বিদ্যা না থাকলেও বুদ্ধি আছে। চোখ-কান খুলে সদা সজাগ থেকে সে একের পর এক অনুসন্ধান করে সত্যপ্রকাশ করতে পেরেছে। অবশ্যই কর্মবীরের নির্দেশে।

পরিচালকের সব থেকে বড় কৃতিত্ব, রহস্যধর্মী বিষয়কে কোনরকম জটিল না

করে খুব স্বাভাবিকভাবে আটপৌরে জীবনের সঙ্গে মিশিয়েছেন। কখনওই মনে হয়নি খুন-খারাপির রহস্যমূলক ছবি দেখছি। বরং রহস্যভেদ ঘটেছে খুব স্বচ্ছন্দ আর সাবলীলভাবে। আঙ্গিকগত দিকেও কোন বাড়াবাড়ি নেই। আবহও অনাড়ম্বর। অভিনয়ের মধ্যেও নেই চড়া সুর। সব কিছুতেই একটা শান্ত ভাব। এমন স্বাভাবিকতা বজায় রাখা খুবই কঠিন কাজ। বোধহয় অভিজ্ঞতার উচ্চস্তরে পৌঁছলেই এমন বড় মাপের কাজ করা সম্ভব। প্রাজ্ঞ পরিচালক তপন সিংহ তাঁর পঞ্চাশ বছরের চিত্রনির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোট ক্যানভাসেও সার্থক সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 'পটল রহস্য' পর্বে পাঞ্জাবী-বেশী নির্মলকুমার (মেকআপের গুণে তাঁকে ধরাই যায় না) পুরনো গ্রামোফোনে যখন শুনছেন সাগলের কণ্ঠে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান', তখন সঙ্গীত পরিচালক তপন সিংহ'র আবহসৃষ্টির কাজ অসামান্য। তাঁর বিদ্রূপাত্মক সংলাপ রচনাও অত্যন্ত ক্ষুরধার।

এই চারটি পর্বের অভিনয় প্রসঙ্গে একটা কথাই বলব, কোন শিল্পীই অভিনয় করেননি, চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছেন শুধু। প্রতিভাবান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তিনি প্রাণবন্ত করেছেন চরিত্রটি। সেইসঙ্গে মনোজ মিত্র, নির্মলকুমার, রবি ঘোষ, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, ধীমান চক্রবর্তী (প্রয়াত রবি ঘোষের জায়গায়), কৌশিক সেন প্রমুখ শিল্পীরাও। হুতমের ভূমিকায় নবাগত কিশোর শিল্পী সোনাই রায়কে দিয়ে যথার্থ কাজটা আদায় করে নিয়েছেন পরিচালক। সোনাইয়ের কৃতিত্বের জন্য তপন সিংহ'র গুণপনাও কম নয়।

দূরদর্শনের খামখেয়ালিতে প্রযোজক-পরিচালকরা মৃতপ্রায়

কলকাতা দূরদর্শনের খামখেয়ালিতে বহু বাংলা সিরিয়ালের প্রযোজক-পরিচালকেরা এখন মৃতপ্রায়। লাখ-লাখ টাকা খরচ করে বহুদিন হল তাঁরা পাইলট-সহ ধারাবাহিকের গোটা চারেক পর্ব জমা দিয়েছেন। কোন কোন প্রযোজককে দূরদর্শনের কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়েও জানিয়েছেন কবে, কখন তা সম্প্রচারিত হবে। কিন্তু কথা দিয়েও কথা রাখছেন না দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ। কী কারণে, তাও জানতে পারছেন না ধারাবাহিকের নির্মাতারা। ফলে, দূরদর্শনের কাছে লাখ লাখ টাকা পড়ে থাকছে। মার খাচ্ছেন প্রযোজকরাই।

এভাবে নতুন নতুন সিরিয়ালগুলো আটকে রেখে কি লাভ হচ্ছে দূরদর্শনের, হিমঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সিরিয়ালগুলোর জীবনীশক্তি কি এতে বাড়ছে? মনে হয়, ঠাণ্ডাঘরে ক্যাসেট রাখায় লাভবান হচ্ছেন তাঁরাই। তা না হলে এমনটা হবে কেন।

আমাদের কাছে খবর আছে, প্রখ্যাত পরিচালক তপন সিংহ'র নতুন ধারাবাহিক 'হুতমের নকশা' নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্দেশিত হবার পরেও তা প্রদর্শিত হয়নি। তার জায়গায় একটা চলতি সিরিয়ালের সমাপ্তি-লগ্নে আরও কয়েকটি পর্ব তাকে বাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। একটা বিশেষ ধারাবাহিকের প্রতি দূরদর্শনের এই অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্ব কেন? কে এর প্রতিকার করবে? তাহলে কি আমরা ধরে নেব, ওই নির্দিষ্ট ধারাবাহিকের প্রযোজকের সঙ্গে দূরদর্শনের কোন কর্মচারির গোপন যোগসূত্র আছে। কিংবা ওই প্রযোজক কর্মসূত্রে দূরদর্শনের সঙ্গেই যুক্ত।

গত সপ্তাহে 'হুতমের নকশা'-র প্রযোজক ছায়াবাণীর রামলাল নন্দীর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। তিনি বলেন, 'পাইলট মনোনীত হওয়া পর দূরদর্শনের কাছ থেকে আমি চিঠি পাই যে, ২৩ জুলাই ডি ডি-২-এ বিকেল তিনটেয় আর ২৪ জুলাই ডি ডি-১-এ রাত আটটায় দেখনো হবে এটি।

কিন্তু কি কারণে তা দেখানো হল না তা জানি না। তপন সিংহকে দিয়ে তেরটা পর্ব শেষ করে আমরা জমা দিয়েছি দূরদর্শনকে। এই ধারাবাহিকটি নির্মাণ করতে আমাদের খরচ হয়েছে লাখ লাখ টাকা। বিনা কারণে এই বিশাল অর্থ আটকে থাকলে প্রযোজকদের কি ক্ষতি হচ্ছে তা কি দূরদর্শনের কর্তৃপক্ষরা বোঝেন না, না বুঝতে চান না। সম্প্রতি আবার নির্দেশ পেয়েছি, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে দেখানো হবে 'হুতমের নকশা' দূরদর্শনে। জানি না এবারেও তাঁরা কথা রাখতে পারবেন কি না?

সাত পাতার শেষাংশ

জঙ্গল ক্যাম্পে। বাইরে অচেনা পাখির ডাক। হাতির ডাক। নদীর শব্দ।

লাঞ্চের পরেই হাতির পিঠে উঠে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে। অনায়াসে নদী পেরিয়ে, গাছ ভাঙতে ভাঙতে হাতি চলল এত গভীর জঙ্গলের দিকে যেখানে সূর্যালোক ছায়ার মতো, যেখানে পচা পাতার গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ। আর নদীর ধারে অলস কুমির। সামনে এসে পড়ে ভাল্লুক। এবং হাতির পিঠে বসে দূরে দেখা যায় গণ্ডারের দল। হঠাৎ চোখে পড়ে আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তারপর দেখা যায় তাকে। দূরে নদীতে জল খাচ্ছে। চিতওয়ানের বিখ্যাত বাঘ। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতি থেমে যায়। মাহুত ইশারা করে বলে, কেউ যেন এতটুকু শব্দ না করি। জল খাওয়া শেষ হলে বাঘ মুহূর্তে মিলিয়ে যায় গভীর বনের মধ্যে যেখানে মানুষের মতো উঁচু ঘাস। এদেরেই বলে টাইগার গ্রাস। আমাদের অরণ্যরোমাঞ্চ সার্থক হয়। সারারাত কাটাই জঙ্গলের মধ্যে, ক্যাম্পে। দূর থেকে ভেসে আসে বাঘের ডাক। আর সেই সঙ্গে কোটি কোটি ঝিঁঝিঁর ডাকে জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ। **সপ্তম দিন :** ব্রেকফাস্ট করেই কাঠমাণ্ডুর পথে রওনা। লাঞ্চ-এর জন্যে থামলাম রিভার স্প্রিং রিসোর্ট-এ। এ আর এক কাব্যিক অভিজ্ঞতা, যার জন্যে 'এক্সটিক নেপাল'-কে ধন্যবাদ। নদীর ধারে এত সুন্দর অরণ্যনিবাস সম্ভবত পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কাঠমাণ্ডুতে ফিরে সন্ধ্যেটা আমার। আর একটু কেনাকাটা করলে হয় না? আর একবার চলে এলাম নিউ রোডের সুপার মার্কেটে কয়েকটা সাবান কেনার জন্যে। আর কয়েকটা লাইটার। **অষ্টম দিন :** মন খারাপ। কাঠমাণ্ডু ছাড়তে হচ্ছে। বিদায় জানাতে হচ্ছে দাশগুপ্তদাকে। আমাদের ফেরার প্লেন সকাল ১১-১৫তে। সুটকেস বেঁধে ব্রেকফাস্ট-এর পরেই তৈরি ৯টার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছনোর জন্য।

ভা গ্য ং ফ ল তি

জ্যোতিষভূষণ

৩ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর



মেষ ঃ
কর্মক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি। শুভ পরিবর্তনের আশা। কোন বন্ধদিনের যোগাযোগ বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে। নতুন সম্পত্তি হঠাৎ করে পেতে পারেন। কোন নিকট আত্মীয়ের জন্য চিন্তিত থাকবেন।

শুভদিন ঃ ৪, ৬, ৯



বৃষ ঃ
কর্মক্ষেত্রে ভাল যোগাযোগ আসছে। হঠাৎ রেগেমেগে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। কোন স্বজনের ব্যথায় ব্যথিত হতে পারেন। পাকস্থলির গন্ডগোলের সম্ভাবনা রয়েছে।

শুভদিন ঃ ৩, ৫, ৭



মিথুন ঃ
সন্তানের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হতে পারেন। দুর ভ্রমনের যোগাযোগ আসছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবেন। লটারিতে যোগ আছে।

শুভদিন ঃ ৫, ৮, ৯



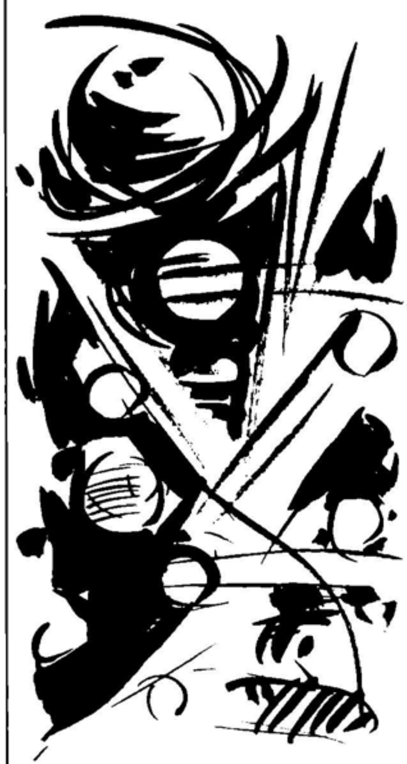
কর্কট ঃ
তীর্থভ্রমনের ইচ্ছাপূরণ হতে চলেছে। বিভিন্ন দিক থেকে অর্থাগমের লক্ষন রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম থাকবে। নতুন জায়গা, বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ আসছে।

শুভদিন ঃ ৬, ৮, ৯



সিংহ ঃ
কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বায়ুজনিত রোগে অসুস্থ হতে পারেন। কোন বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের শুভ।

শুভদিন ঃ ৪, ৭, ৯





কন্যা ঃ
উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ করুন। পরীক্ষার্থীদের ভাল সময়। সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের শুভ সময়। বাড়িতে বহু স্বজন সমাগমের সম্ভাবনা।

শুভদিন ঃ ৩, ৫, ৭



তুলা ঃ
সপ্তাহটিতে একটু সচেতন থাকুন। মতান্তর হতে পারে চকুরীক্ষেত্রে ও গৃহে। প্রেম-প্রীতির যোগাযোগ রয়েচে। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন।

শুভদিন ঃ ৫, ৬, ৭



বৃশ্চিক ঃ
নতুন ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করতে পারেন। বকেয়া কোন টাকা হঠাৎ পেতে পারেন। শত্রু পক্ষ আপনার সঙ্গে সমঝোতা করতে পারে সর্দি-কাশিতে কষ্ট পাবেন।

শুভদিন ঃ ৬, ৮, ৯



ধনু ঃ
নতুন ব্যবসা শুরু করুন। ভাল সময় আসছে। পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির শরীরের প্রতি নজর রাখুন। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন।

শুভদিন ঃ ৩, ৬, ৭



মকর ঃ
হঠাৎ প্রাপ্তি যোগ। দুরভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। মানসিক অবসাদ আসতে পারে।

শুভদিন ঃ ৫, ৪, ৯



কুম্ভ ঃ
বিভিন্ন দিক থেকে অর্থ আসবে। চটপট কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। গৃহসংস্কার হতে পারে। চাকুরি ও ব্যবসাক্ষেত্রে শুভযোগ।

শুভদিন ঃ ৩ , ৪, ৫

মীন ঃ



নানা দিক থেকে শুভ যোগাযোগ। হাঁপানি কিংবা বুকে ব্যথা হতে পারে। আমাশয় কষ্ট পেতে পারেন। কোন ভারি জিনিস তুলবেন না। লটারিতে যাবেন না।

শুভদিন ঃ ৭, ৮, ৯

মুম্বই খবর

'মোহব্বত'



'মোহব্বতের' সেটে কি বোঝাচ্ছেন পরিচালিকা রীমা অভিজ্ঞ মাধুরিকে? ছবি হাফিজুল রহমান

ময়রা নিজের মিঠাই কখনও খারাপ বলেনা, তাই মুম্বাই-এর ফিল্মী কাহানি লেখিকা অধুনা চিত্র পরিচালিকা রীমা রাকেশনাথ নিজের প্রথম ছবি 'মোহব্বত' সম্পর্কে আশাবাদী হবেন এটাই স্বাভাবিক।

ভেনাস কোম্পানির স্নেহা শর্মার মুখেই প্রথম শুনি রীমা লেখার পাশাপাশি নির্দেশনায় আসছেন। লেখিকা হিসেবে রীমার এলেম জানা থাকলেও ক্যামেরার পেছনে রীমাকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরেই ওর কাছে যাওয়া।

স্নেহাই রীমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। মুম্বাই ফিল্মসিটিতে পৌঁছে দেখি জোরকদমে স্যুটিং চলছে। ছবির নাম 'মোহব্বত'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে প্রেম কাহিনী। আমাদের প্রেমকাহিনী 'মোহাব্বত' এর নায়ক অক্ষয় খান্না আর সঞ্জয় কাপুর। নায়িকা একমেবাদ্বিতীয়ম মাধুরী দীক্ষিত। 'মোহব্বত' এর তিন কেন্দ্রিয় চরিত্রকে নিয়েই স্যুটিং চলছিল। ইমোশনাল সট টেক করছিলেন রীমা। সটব্রেকের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছিলাম রীমার সঙ্গে। প্রথম ছবি হলেও বোধহয় স্যুটিং স্পটে হাজির ছিলেন স্বামী রাকেশ আর ছবির প্রযোজক রীমার ধর্মভাই ইউসুফ।

শুনেছিলাম সাজনের পর 'প্রেমপূজা' ছবি দিয়ে হতে চলছে পরিচালিকা রীমার হাতেখড়ি। অনিল কাপুর, সালমান খান আর মাধুরি কে নিয়ে ছবির মহরতও হয়েছিল। তারপরই রীমার প্রোজেক্ট বিশবাঁও জলের তলায়। ঢাকঢোল বাজিয়ে মহরত হলেও পরে ছবির স্যুটিং হয়নি। সন্দেহ ছিল সেই পুরোনো ছবি 'প্রেমপূজা'ই নতুন বোতলে পুরোনো মদের মত লেবেল পাল্টে ফিরে এসেছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় রীমা জানালেন—'হাম আপকে হ্যায় কওন' ছবির জন্য সালমান আর মাধুরি টানা ডেট দেওয়ায় পুরো পরিকল্পনাই ভেসতে গেছে। তাই গোটা ছবিটি নিয়েই নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।' নায়িকা হিসেবে মাধুরি থাকলেও সালমানের জায়গায় এসেছেন অক্ষয় খান্না আর অনিলকে রিপ্লেস করছেন ওর ছোটভাই সঞ্জয় কাপুর। সালমান আর অনিলের পরিবর্তে সঞ্জয় আর অক্ষয় নির্বাচনের জন্য প্রেমপূজার গল্পের খোলনলচে বদলে ফেলতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গে বিশেষ করে নবাগত স্টারদের ইমেজের কথা ভেবেই গোড়া থেকে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়েছে। তাই ছবির থিম ঠিক



'মোহব্বত' ছবিতে এক আবেগ পূর্ণ দৃশ্যে নবাগত নায়ক সঞ্জয় কাপূরের সঙ্গে সিজনড্ অ্যাকট্রেস মাধুরি দীক্ষিত

ছবি ঃ হাফিজুল রহমান

থাকলেও ছবির আঙ্গিক গেছে বদলে। জানালেন রীমা।

বুকের পাটা আছে পরিচালিকার, না হলে প্রথম পরিচালনা করতে এসে মাধুরির মত সিজনড এ্যাকট্রেসের বিপরীতে সঞ্জয় আর অক্ষয় খান্নার মত নবাগত অভিনেতাকে কাস্টিং করেন। তর্কের খাতিরে যদিও বা ধরে নেওয়া যায় রাজা ছবির এর আগে মাধুরির বিপরীতে অভিনয় করছেন সঞ্জয় কাপুর এবং দর্শকেরাও তা নিয়েছে। তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'দয়বান' ছবির নায়িকা মাধুরির রিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বিনোদ খান্না। এবার 'মোহব্বত' ছবির নায়িকা সেই মাধুরী অভিনয় করেছেন বিনোদ খান্নার ছেলে অক্ষয় এর সঙ্গে । দর্শকেরা কি এতই বোকা যে এটা মেনে নেবেন?

রীমার কাছে প্রশ্ন উথাপন করতেই খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েই জানালেন—বিদেশে যখন স্টারদের বয়স হয় তখন বলা হয় ওদের অভিনয়ে ম্যাচুইরিটি এসেছে। মাধুরির বিপরীতে সঞ্জয় আর অক্ষয়ের কাস্টিংকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিতে চাই আমি।

'মোহব্বত' কি সাজনের মত ত্রিকোন প্রেমের গল্প? রীমার কাছে প্রশ্ন রাখলে তিনি প্রতিবেদকের মুখের কথা কেড়ে জানালেন—সাজনের মত (মোহব্বত ও ভাবনাত্মক প্রেমকাহিনী। সাধারণ প্রেমকাহিনী বা লাভস্টোরির সঙ্গে এর কোন মিল নেই। মামুলি সাফাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রীমাকে চেপে ধরলাম। এড়াতে না পেরে তিনি জানালেন, সাজনের সঙ্গে মোহব্বত এর সাদৃশ্য শুধু দুটো ছবিই লাভস্টোরি। এর বেশী কিছু নয়। আসলে বিরাট সাফল্যের জন্যই 'সাজন' অন্য লাভস্টোরির কাছে রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেমের গল্প লিখতে গেলেই অবধারিত ভাবেই কোন না কোন ভাবে সাজন ঘুরে ফিরে চলে আসছে।

'শোলের' গব্বার সিং এর ভূমিকায় অভিনয় করার পর আমজাদ খানের মত দুর্দান্ত অভিনেতা যেমন গব্বর এর ইমেজ তাড়া করে ফিরেছে, 'সাজন' এক ইমেজ আমাকেও তেমন তাড়া করছে। একেই বোধ হয় বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা —হেসে জানালেন রীমা।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। আলোচনার সুতোর গোড়া ধরে টান মারলেন রাকেশ। ভয় হয় প্রেমের সামনে বেফাঁস কিছু বলে ফেলবেন রীমা। তাই নিজেই স্ত্রীর স্বঘোষিত প্রতিনিধি হয়ে সাফাই দিতে শুরু করলেন। মাধুরির সেক্রেটারি হবার সুবাদে প্রেস আর মাধুরির মধ্যে অদৃশ্য দেওয়াল তোলার কাজটিকে শিল্পের পর্যায় নিয়ে গেছেন রাকেশনাথ, এখন সেই রাকেশনাথকেই প্রেমের সামনে সাফাই দিতে দেখে বেশ মজা পাচ্ছিলাম।—মোহব্বত সাজনের চেয়ে অনেক ভাল ছবি। মোহব্বত দেখলে লোকে ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলে শুধু শুধু মোহব্বত করবে। দাবি করলেন তিনি। মাধুরির বিপরীতে অক্ষয় আর সঞ্জয়ের নির্বাচনের সমর্থনেও স্ত্রীকে জোরালো সমর্থন জানালেন তিনি। ওর মতে—মোহব্বত এ মাধুরিকে দেখে সঞ্জয় আর অক্ষয়ের সমবয়সী বলেই মনে হবে। দর্শকেরা সাগ্রহে এই ত্রিমুর্তিকে গ্রহণ করবেন। কারণ স্টার কাস্টিং এ নয়, এ ছবির ট্রিটমেন্টেই আছে আসল চমক।

রীমার প্রথম ছবি 'মোহব্বত' এর প্রেমে পড়েছেন প্রযোজক ইউসুফ ভাট। ধর্মবানের ছবিতে জলের মত টাকা খরচে কার্পণ্য করেননি। নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে অবাক করার পর ভার্জিন লোকেশানে আউটডোর স্যুটিং করে দর্শকদের চমক লাগাতে চান 'মোহব্বত' এর পরিচালক। টার্গেট আড়াই ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ করে দর্শকদের সিটে বসিয়ে রাখা।

'মোহব্বত' এ পাঁচটি গানের দৃশ্য বিদেশের এমন লোকেশানে স্যুটিং হয়েছে যে এর আগে অন্য কোন ফিল্ম ইউনিটের পা সেখানে পড়েনি। শুধু মোহব্বতের কথাই বা বলি কেন, রীমার মাধুরি ফিক্সেশান এতটা যে এক নয়, দুই নয়, পর পর চারটি ছবির গল্প লিখেছেন তিনি। নায়িকা! আবার কে? ওয়ান অ্যান্ড অনলি মাধুরি দীক্ষিত।

পর পর গল্পের ধাক্কায় মাধুরির কেরিয়ার এখন বেসামাল। এই সময় মাধুরিকে নিয়ে প্রজেক্ট করা মানেই নিজের কেরিয়ারের বারোটা বাজান। এ ব্যপারে জানতে চাইলে প্রতিবেদকের ভিকট্রি সাইন দেখালেন রীমা। এ মাসেই ছবিটি মুক্তি পাবে। আত্মবিশ্বাসী পরিচালিকার দাবী কতটা সত্যি ' মোহব্বত' না দেখলে বোঝা যাবেনা।

ক্যুইজ

ক্যুইজের জনপ্রিয়তার কথা নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবজেকটিভ প্রশ্নের প্রাধান্য থাকায়, ক্যুইজের চাহিদা আরও বেড়ে গিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকরাও এখন এ ব্যাপারটিতে রীতিমত সচেতন।

'ক্যুইজ' শুধু সময় কাটানোই নয়। অনুশীলন, বুদ্ধিচর্চা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এর অবদান অনস্বীকার্য। আবার এর একটা মজাও আছে। যাঁরা খুঁটিনাটি খবর রাখেন, তাঁরাই এই মজাটা অনুভব করেন। টুকরো-টুকরো তথ্যের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞানার্জন এই ক্যুইজের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রতি সংখ্যায় কুড়িটি করে প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর পাওয়া যাবে পরবর্তী সংখ্যায়।

প্রশ্ন :

(১) কোন বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম 'ক্যুইজ'?
(২) গান্ধীজি কাকে বলেছিলেন 'প্রিন্স অফ পেট্রিয়টস'?
(৩) কার জন্মদিনকে স্মরণ করে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়?
(৪) 'ভানুসিংহ' কার ছদ্মনাম?
(৫) 'থান্ডার বোল্ট অব বেঙ্গল' কাকে বলা হয়?
(৬) 'দাদাঠাকুরের' আসল নাম কি?
(৭) কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র কে?
(৮) ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মানটির নাম কি?
(৯) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শহিদ কে?
(১০) শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রীয় প্রতীকটি কি?
(১১) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
(১২) বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে?
(১৩) সবচেয়ে ছোট মহাদেশটির নাম কি?
(১৪) 'জ্ঞান পীঠ' পুরস্কার দেওয়ার কে ব্যবস্থা করেন?
(১৫) 'ব্যোমকেশ' চরিত্রের সৃষ্টি করেন কে?
(১৬) কোন ক্রিকেটারের ডাকনাম 'টাইফুন'?
(১৭) ভুটানের জাতীয় ক্রীড়াটি কি?
(১৮) কোন দেশে একটিও নদী নেই?
(১৯) বিছুটি গায়ে লাগলে গা জ্বালা করে বা চুলকায় কেন?
(২০) 'ক্রিসকোগ্রাফ' যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে?

❑ সংগ্রহ : শুভা চক্রবর্তী

শব্দভেদ

১		❄	৪	❄	১৪	❄	❄
	❄	❄	৫			৬	
২	৭	৩		❄	❄		❄
❄	৮		❄	❄	১৯		২০
৯			❄	১৮			
❄	২১		১৩	❄	❄	❄	❄
১০	❄	১২				১৫	১৭
১১		❄			❄	১৬	

পাশাপাশি :
১। আশীর্বাদ
২। নগরী
৫। বিধায়কদের বসবার জায়গা
৮। সব্জি
৯। ছেলের মায়ের সঙ্গে মেয়ের মায়ের সম্পর্ক
১১। সূর্য
১২। বিখ্যাত বাউল কবি
১৬। রামের পুত্র
১৮। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
১৯। প্রতিবেশী রাজ্য
২১। মুসলমান সম্রাট।

উপর নীচ :
১। চাষী
৩। অতীতের বিখ্যাত নায়িকা
৪। পদ্য ৬। মিলেমিশে থাকার বাসস্থান
৭। লিবিয়াবাসী
১০। বাসা
১৩। যে গরু দুধ দেয় না
১৪। অরণ্য
১৫। মারার একটি পদ্ধতি
১৭। আওয়াজ
১৯। রসাল ফল
২০। হৃদয়।

বুবুন চক্রবর্তী

লেহেঙ্গা চোলিতে ফাস্ট লেডি

ছবি ও লেখা : পূরবী দাশগুপ্ত
মডেল : সপ্তর্ষী ব্যানার্জী





কলকাতার নতুন সপিং কমপ্লেক্স শ্রীরাম আর্কেড-এ অভিজাত বুটিক 'ফার্স্ট লেডি।' এদের উদ্দেশ্য এবার পুজোয় কলকাতার প্রতিটি মেয়েকে ফ্যাশানের ফার্স্ট লেডি বানানো। সন্দেহ নেই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে এদের লেহেন্দী চোলি ও সালওয়ার কামিজের স্রোত বইবে। এমনই অভিনব ডিজাইন সে চোখ ফেরানো যায় না। দামও আয়ত্তের মধ্যে। **এই লেখার কাটিং নিয়ে গেলে বিশেষ ছাড়।**

পোষাক সৌজন্য - ফার্স্ট লেডি
শ্রীরাম আর্কেড শপ নং



ছবি ৪ আমাদের পরিচিত সালওয়ার কামিজ ডিজাইন ও কাটিং এর ফলে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে এবং আপনাকেও অসামান্য করে তুলতে পারে, নবমীর রাতে এই পোষাকটি পরে দেখুন।

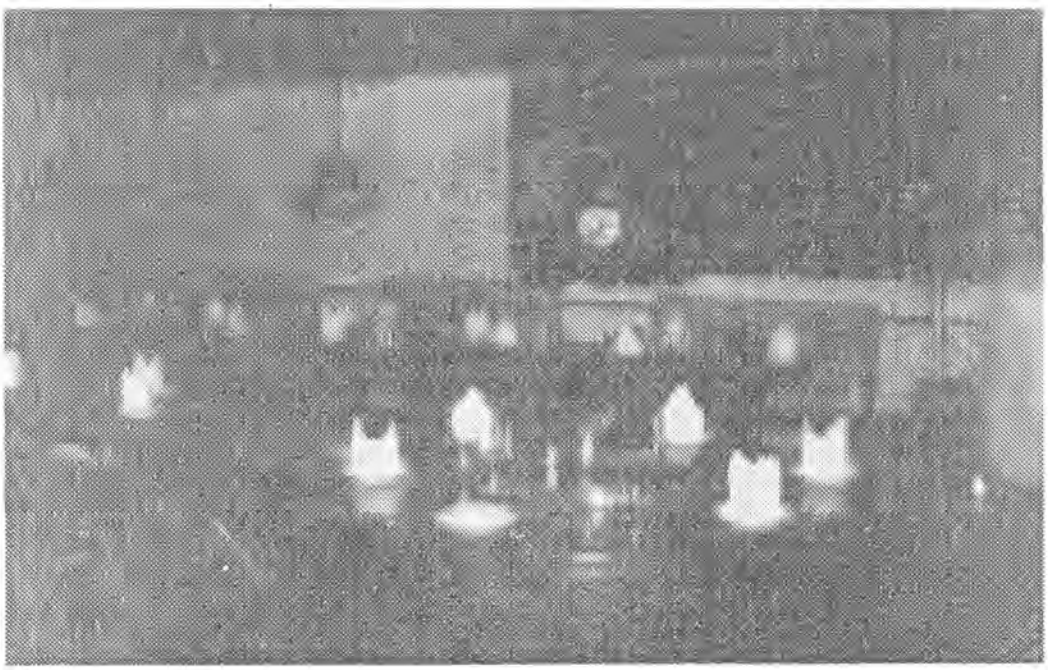


ছবি ১
লাল সিফনের লেহঙ্গা কামিজ উড়নীতে এবং কামিজে অভিনব জরির কাজ। সপ্তমীর সন্ধ্যায় এই পোষাক আপনি সত্যই ফার্স্ট লেডি

ছবি ২
অষ্টমীর সকালে অভিজাত মুঘল ঘরানার এই অসামান্য সাদা-কালার পোষাকটি পরে আপনি মোহিনী হয়ে উঠুন

ছবি ৩ ময়ূরকণ্ঠী রঙের লেহেঙ্গা ও কাঁচ বসানো ম্যাচিং চেলি, সেন আপনাকে অতুলনীয় করতেই তৈরী। সঙ্গে ম্যাচিং উড়কীর ঘেরাটোপে অষ্টমীর রাতে আপনি বিশেষ এক নারী

উৎসবে ঘরে কাবাব



পূজোয় কোন্ বাড়িতে না অতিথি আসেন? আর অতিথি এলেই সব থেকে বড় সমস্যা কি খেতে দেবো? আর এক সমস্যা এমন চট জলদি কাবাব কোথায় পাবো, যা সকলেরই মনপসন্দ উত্তর জানাচ্ছেন চিত্র সাংবাদিক পূরবী দাসগুপ্ত।

পার্ক স্ট্রিটের 'পিটার ক্যাট' কাবাবের জন্য প্রসিদ্ধ। যে কোনো উৎসবে বা ছুটির দিনে কাবাব খেতে কলকাতাবাসী লাইন দেয় এই রেস্তোরার সামনে।

এই সব কাবাব কি বাড়িতেও তৈরি করা যায়?

হ্যাঁ যায়! পিটার ক্যাটের মালিক কোঠারী উদার হৃদয়ে জানিয়ে দিলেন, কি ভাবে, এই কাবাব সহজেই বাড়িতে করা যাবে। তারপর একটু হেসে বললেন, পুজোর কদিন আমি চাইব আমাদের কাবাব বাঙালির রান্নাঘরে তৈরী হোক।

পনির টিক্কা ৪ জনের মতো

উপকরণ :

বাজারের কেনা ছানা ২৫০ গ্রাম

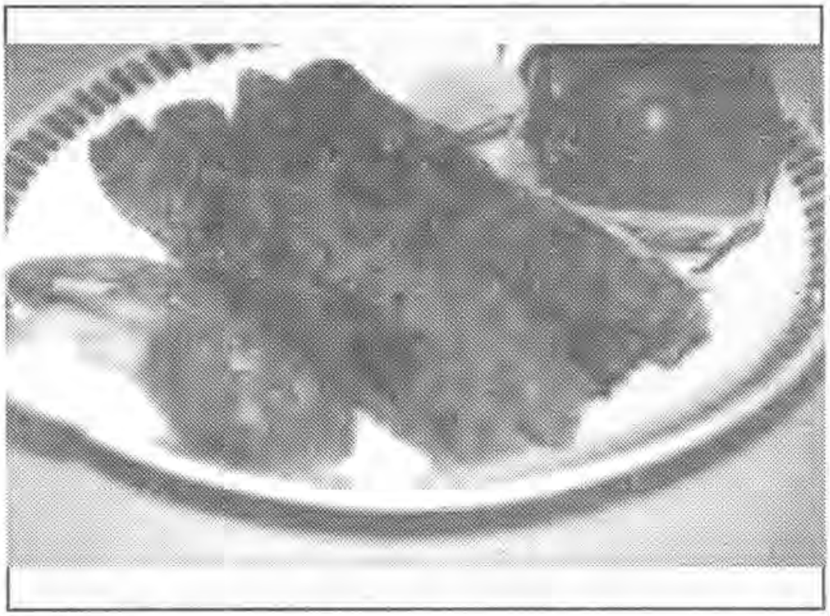
টকদই ১৫০ গ্রাম

গরম মশলা-বাটা ১ চা চামচ

আদা / রসুন বাটা প্রতিটি ১ চা চামচ

নুন / গুড়ো লঙ্কা আন্দাজ মতো

পদ্ধতি : ছানার চৌকো টুকরো করে নিন, দই ভালো করে ফেটিয়ে তাতে সবকটি বাটা মশলা ও আন্দাজ মতো নুন মেশান, ছানার টুকরোগুলো তাতে



ম্যারিনেট (মিশিয়ে) করুন, অন্ততঃ ২/৩ ঘন্টা ম্যারিনেট করতে হবে। এবার পিসগুলি দই এর মিশ্রণ থেকে তুলে একটি জালের (স্টিলের হলে ভালো হয়) উপর রেখে কাঠকয়লার আগুনে সেকতে দিন। মাঝে মাঝে উলটে দিতে হবে। অথবা একটি গ্রিল প্লেটে অল্প রিফাইন তেল মাখিয়ে, একটি শিকের মধ্যে একটুকরো ছানা, এক টুকরো ক্যাপসিকাম, এক টুকরো পেঁয়াজ, এই ভাবে গেথে আভেনে বেক করুন, ছানার টুকরো বাদামি রঙ ধরলে নামিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মটন শিক কাবাব ৪ জনের মতো

উপকরণ :

মাংসর কিমা ৫০০ গ্রাম

পেঁয়াজ বাটা ১৫০ গ্রাম

আদা / রসুন বাটা প্রতিটি ১ চা চামচ

পেঁপের রস ২ চা চামচ

টক দই ১৫০ গ্রাম

গরম মশলা বাটা ১ চা চামচ

নুন আন্দাজ মতো

ময়দা ১৫০ গ্রাম।

পদ্ধতি : মাংসের কিমা খুব ভালো করে ধুয়ে জল ঝড়িয়ে রাখুন, এবার একটি পাত্রে ম্যারিনেশন মিশ্রণ তৈরী করুন। দই ভালো করে ফেটিয়ে নিন তাতে সবকটি বাটা মশলা মেশান। পেঁপের রস মেশান এবং আন্দাজ মতো নুন দিন। এতে কিমা মিশিয়ে ম্যরিনেট করুন অন্ততঃ ৫/৬ ঘন্টা। এবার শিক ধুয়ে এবং শুকনো করে তাতে এই কিমার মিশ্রণ চেপে চেপে লাগান। আট করবার জন্য হাতে করে ময়দা নিয়ে কিমার উপর চেপে চেপে দিন। কাবাবের মাপ ৪ থেকে ৬ ইঞ্চির মতো লম্বা করবেন। এইভাবে পরপর কয়েকটি সিকে কিমার মিশ্রণ লাগান। এবার কাঠকয়লার আগুনে একটি জালের উপর শিকগুলি সাজিয়ে ঝলসাতে দিন। মাঝে মাঝেই শিক ঘুরিয়ে দেবেন। যাতে সবদিকেই ঠিক মতো আগুনের উত্তাপ লাগে। কাবাব বাদামি রং ধরলে শিক থেকে আস্তে করে বের করে প্লেটের উপর সাজিয়ে দিন, স্যালাড এবং সসের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফিস টিক্কা ২ জনের মতো

উপকরণ -

ভেটকি মাছ (কাটা ছাড়ানো) ২৫০ গ্রাম

টক দই ১৫০ গ্রাম

আদা বাটা ১ চা চামচ

রসুন বাটা ১ চা চামচ

গরম মশলা ১ চা চামচ

পদ্ধতি : মাছের চৌকো টুকরো করে নিন। দই ফেটিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। তাতে আদা বাটা, রসুন বাটা, গরম মশলা বাটা ও আন্দাজমতো নুন মেশান, এবার এই মিশ্রণে মাছের টুকরোগুলি ম্যারিসট করুন। ২/৩ ঘন্টা ম্যারিসট করে মাছের টুকরোগুলি কাঠকয়লার আগুনে জালের উপরে রেখে ঝলসে নিন অথবা গ্রিল প্লেটের উপর অল্প তেল মাখিয়ে ওভেনে দিয়ে 'গ্রিল করুন' মাঝে মাঝে উল্টে নেবেন। ঝলসানোর রঙ ধরলে, প্লেটে সাজিয়ে স্যালাড দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছবি ও লেখিকা : **পূরবী দাসগুপ্ত**



ভারত আমার ঃ অ্যালেনা আদামকোভা



অ্যালেনা আদামকোভা। স্লোভাকিয়ার মেয়ে অ্যালেনার বাবা মস্কোতে অধ্যাপনা করতেন। সেই সূত্রে ছোটবেলা থেকে তিনি মস্কো শহরে মানুষ। দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী অ্যালেনা একদিন মস্কো শহরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর বক্তৃতা শুনে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে অ্যালেনার এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন—প্রবীর চক্রবর্তী।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন। রুশ, স্লাভাক ও ভারতীয়দের সহযোগিতায় তিনি তৈরি করেছেন রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তিন পর্বের একটি ভি, ডি ও, ফিল্ম। ফিল্মটি নিয়ে তিনি মান্ডি হাউসের কাছে বার-বার আবেদন করে আসছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষে দূরদর্শনে যাতে ফিল্মটি দেখানো হয়। কিন্তু মান্ডি হাউস এখনও নীরব।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ৩২ বছরের অ্যালেনার পান্ডিত্য প্রশংসার দাবি রাখে। মূল সংস্কৃত থেকে তিনি তাঁর মাতৃভাষা ও রুশ ভাষায় অনুবাদ করে চলেছেন। ভারতই এখন অ্যালেনার বাসভূমি।

প্রশ্ন ঃ ভারতবর্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আপনি এসেছেন। ভারতের এই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি?

অ্যালেনা ঃ কোন রাজনৈতিক, মন্তব্যের মধ্যে অমি নেই। কেননা স্বাধীনতা হল স্বতঃ- স্ফূর্ততা। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কোন অসন্তোষ জনক মন্তব্য করতেও আমি আগ্রহী না। তবে এটুকু বলতে পারি, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের দেশ হল ভারত। ভারতবর্ষ মুনি-ঋষির দেশ। এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রয়েছে বিপুল ঐতিহ্য, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। সত্য সাধানার পুন্যভুমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যেন আমার কাছে 'যৌবনের উপবন, বার্ধ্যকের বারাণসীই' বটে।

প্রশ্ন ঃ আপনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দর্শনে অনুপ্রাণিত হলেন কেন?

অ্যালেনা ঃ এর একমাত্র কারন এঁদের আদর্শ ও মূল্যবান বাণী। যে বাণী প্রতিটি জীবনের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষকে সেবা করার কথাই বার বার আমাকে আকর্ষণ করেছে। 'জীবই শিব' এটাই বড় কথা। আর মানুষই ভগবান, এটাই চিরন্তন সত্য।

প্রশ্ন ঃ Different of opinion different of Way. এ ব্যাপারে অপানার মন্তব্য?

অ্যালেনা ঃ (ভাঙা বাংলায় মিষ্টি করে) 'যত মত তত পথ'। ছোট কথার মধ্যেই বিরাট দর্শন লুকিয়ে রয়েছে। এখানেই রামকৃষ্ণ মাহাত্ম্য।

প্রশ্ন ঃ বিবেকানন্দ আপনার চোখে ব্যতিক্রম কেন?

অ্যালেনা ঃ এক কথায় 'পারফেকশন'।

প্রশ্ন ঃ ভারতীয় সংস্কৃতি আপনার মন কাড়ে। আপনার মনের মত ভারতীয় শিল্পী কে?

অ্যালেনা ঃ তালিকায় অনেকেই রয়েছেন। তবে, মনের মত শিল্পী বলতে, দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বাঁশীবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া আর সঙ্গীতে কিশোরি আমোনকার।

প্রশ্ন ঃ সংস্কৃতভাষা শেখার জন্য আপনি একদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন। দুঃখের বিষয় আপনি হয়তো জানেন না যে, পশ্চিমবঙ্গসরকারের শিক্ষা দফতর 'সংস্কৃত' ভাষাকে 'ডেড-ল্যাংগুয়েজ' হিসেবে বাতিল করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

অ্যালেনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছে বা না করেছে তা নিয়ে কোন বিতর্কে যেতে আমি রাজি নাই। তবে ভারতের মুল সংস্কৃতিকে জানতে গেলে অবশ্যই সংস্কৃত জানার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত ভাষাই তো বাংলার মূল স্রোত। সুতরাং বাংলা ভাবাকে ভালভাবে জানতে গেলে, অবশ্যই সংস্কৃত জানার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। স্কুল লেভেল থেকেই এই ভাষা জানার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ঃ ভারতের কি কি আপনার ভাল লাগে?

অ্যালেনা ঃ ভারতের সবটাই আমার ভাললাগে কিন্তু একটা ব্যথার দিকও রয়েছে।

সেটি দারিদ্র্য। আমি একদিন কলকাতার একটি বস্তিতে গিয়েছিলাম। সেখানে মানুষ যে এইভাবে থাকতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না। পরদিন তাজ বেঙ্গলে আমাকে একজন খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আগের দিনের কথা স্মরণ করে আমি খেতেই পারলাম না। আমার বমি হয়ে গেল। বাস্তবিকই দুঃখের ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ বিদেশিনী হিসেবে ভারতবর্ষের মানুষের কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার পেয়েছেন?

অ্যালেনা ঃ অনেকের কাছে থেকেই যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তবে অনেকে আবার অনেকে বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপপ্রচারও ছড়ানো হয়। তবে যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করেন তাঁদের অসুবিধা অনেক। আমার কাজ মুখ্যতঃ মিশনের মধ্যেই। তাই আমার খুব বেশি অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি জ্যোতি বসু কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন?

অ্যালেনা ঃ ওটা ঠিক আমার বিষয় নয়। বলে হেসে ফেললেন অ্যালেনা। তবে সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে জানালেন, উনিতো বিখ্যাত মানুষ।

প্রশ্ন ঃ ভারতের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন কি ব্যাপারে?

অ্যালেন্যা ঃ বড্ড জটিল প্রশ্ন, তবে আমার উত্তর হল, মানুষ যদি মানুষ না হয়, কাউকে যদি না মানে; তারাই মুলতঃ সমাজে ক্ষতিকারক।



মহাকালের দার্জিলিং

মহাকাল প্যালেসের জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা





যে-ঘরে বাতাস-বৃষ্টির সঙ্গে আলাপ হল

মেরে কিচেন মে শেফ্ ?



রেস্তোঁরার শেফ্ রেস্তোঁরার।

শালিমারের শেফ্ আপনার।

মজাদার সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর রান্না এর আগে কখনও এত সহজ ছিল না। শালিমারের শেফ্ মশলা আপনার রান্নায় এনে দেয় **এমন চমৎকার স্বাদ** যে রেস্তোঁরার শেফ্-এর রান্নাও তার পাশে পান্‌সে। আর একদম খাঁটি, তাজা মশলা বলে এটি আপনার পরিবারের সকলেরই স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ। শেফ্ মানেই **'টেস্টি টেস্টি খানা'**। আর শালিমার মানে শুদ্ধ তার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। শালিমারের শেফ্ মশলা। এটা ছাড়া আপনার রান্নার আয়োজন কি করে সম্পূর্ণ হতে পারে?

শালিমার নারকোল তেল প্রস্তুতকারকের
আরও একটি উৎকৃষ্ট উপহার

Shalimar's

CHEF

শেফ্ মশলা

● হলুদ ● ধনিয়া ● জিরা ● লঙ্কা

তাজা যেন ঘরে তৈরী

TSPL/SCW/CHEF-97-98-B

শালিমার শেফ্ ছাড়া অন্য কোন নামে গুঁড়ো মশলা উৎপাদন করে না